





প্রাচীন পৃথিবী







Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VI [Vide Notification T. B. No. VI/H/79/29. dated 5.12.79]

প্রাচীন পৃথিবী

(ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস)

শ্রীবলাইমোহন রায়চোধুরী, এম. এ, বি-এড্
অভিজ্ঞ ইতিহাস শিক্ষক, শ্যামবাজার এ, ভি স্কুল (কলিকাতা)
(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ)

ও

শ্রীবিজয়পদ সরকার, এম. এ, বি-এড্
প্রধান শিক্ষক, বাডনগরা হাইস্কুল (মালদহ), প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, কালীঘাট ওরিয়েন্টাল একাডেমী (কলিকাতা), রামনগর হাই স্কুল, বারুইপুর ২৪ পরগণা) ও সহকারী প্রধান শিক্ষক, টালীগঞ্জ অশোকনগর বিদ্যাপীঠ (কলিকাতা)

রীডার্স হোম
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১২১সি, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্ত্তী
রীডার্স হোম
১২১সি, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরিমার্জিত সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৮৩
মূল্য : পরিশিষ্টসহ সাত টাকা মাত্র
9-00

মুদ্রাকর :
নিউ ভারতী প্রেস
শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা, ইতিহাস রচনার উপাদান, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি।	১—৪
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আদিমানব; পুরাতন প্রস্তর যুগ, নূতন প্রস্তর যুগ, খাদ্য উৎপাদন, নূতন প্রস্তর যুগের অগ্রগতি, যানবাহন, মানুষের সামাজিক জীবনের বিকাশ, ধর্ম বিশ্বাস, শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধ, ভাষারজন্ম, উৎপাদনের দেবতার পূজা।	৫—১১
তৃতীয় অধ্যায়ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জযুগঃ সভ্যতার প্রবণতা, কৃষি পদ্ধতির জন্ম, কৃষি ও কারুজীবি সম্প্রদায়ের উদ্ভব, বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভবে সমাজ জীবনের পরিবর্তন, বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, শিশু রাষ্ট্রের উদ্ভব, নদী উপত্যকায় সভ্যতা বিকাশের কারণ।	১৪—১৮
চতুর্থ অধ্যায়ঃ পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা। মিশরঃ অবস্থান ও ভূমি প্রকৃতি, ফ্যারাও ও পুরোহিত সম্প্রদায়, মিশরীয় লিপি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পিরামিড ও ধর্মীয় বিশ্বাস, মিশরের দেবদেবী, মিশরীয়দের প্রধান প্রধান উপজীবিকা। সিন্ধু-সভ্যতাঃ অবস্থান, সিন্ধু-সভ্যতার বিবরণ, খাদ্য ও ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী, শিল্প-সামগ্রী, ব্যবসা, বাণিজ্য, ধর্ম বিশ্বাস, দেবদেবী, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের বিবরণ। চীনঃ হোয়াং হো ও ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকায় গড়ে উঠা সভ্যতার বিবরণ, চীনের প্রাচীন ইতিহাস। নদী তীরবর্ত্তী উপত্যকায় গড়ে উঠা সভ্যতা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির বিবরণ।	২০—৪৭

বিষয় | পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায় : লৌহ যুগ : লোহা আবিষ্কার ও তার ব্যবহার, রাজতন্ত্রের আবির্ভাব। ব্যাবিলন : কৃষি ও বাণিজ্য, মন্দির ও পুরোহিত শ্রেণী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, হামুরাবির আইন-বিধি সার্ব্বভৌম শক্তি হিসাবে মিশর ; উপনিবেশিক আধিপত্য ও পুরোহিতগণের ক্ষমতা। ৫০—৫৯

ইরাণ : পারসিক সাম্রাজ্যের উত্থান, দারায়ুস, ম্যারাথনের যুদ্ধ, থার্মোপিলীর যুদ্ধ, জরথুষ্ট্র প্রবর্ত্তিত ধর্মের মূল কথা। ইহুদী জাতি : মিশরে হিব্রুজাতির ইতিহাস, ক্রীতদাসত্বের মুক্তি ও প্যালেষ্টাইনে বসতি স্থাপন। গ্রীস : ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা, হোমারের যুগ, গ্রীক দেবদেবী, এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন এবং তুলনা মূলক আলোচনা এথেন্স, স্পার্টা. এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে তুলনা, সভ্যতার অগ্রগতিতে এথেন্সের অবদান, পেরিক্লিসের অবদান, নাট্য-সাহিত্য, সফোক্লিস, দর্শন, সক্রেটিস, হেরোডটাস, ম্যাসিডন রাজ্য, আলেকজাণ্ডার, গ্রীসের পতন। ৫৯—৮০

রোম : রোমের প্রতিষ্ঠা, কার্থেজের সংগে সংঘর্ষ, হানিবল, রোমের সমাজ, রোমের শাসনতন্ত্র, ক্রীতদাস বিদ্রোহ, জুলিয়াস সীজার, সাম্রাজ্যের যুগে রোমের অগ্রগতি, উত্থান এবং পতন, খৃষ্টধর্ম। চীন : সাংরাজ বংশ, চীনের মহাপ্রাচীর, চৌ-বংশ, কনফুসিয়াস। ৮১—৯৪

ভারতবর্ষ : আর্য্যদের আগমন, বসতিস্থাপন, বেদ, আর্য্যদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন, মহাকাব্য ; জৈন ও বুদ্ধ ধর্ম ; ভারতীয় সাম্রাজ্য ; মৌর্য্য সাম্রাজ্য, অশোক, কণিষ্ক, গুপ্ত-বংশ, সমুদ্রগুপ্ত, গুপ্ত-সাম্রজ্যের পতন পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গদেশের বিবরণ, বৈদেশিক সংযোগ, বিদেশী ভ্রমণকারীগণের বিবরণ, প্রাচীন ভারতের শিল্প, ভাস্কর্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিবরণ। ৯৪—১১২

প্রাচীন পৃথিবী

প্রথম অধ্যায়

(ক)

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে মানুষের নানা কাজ-কর্মের বিবরণই **ইতিহাস**। মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশের সূচনা থেকে কিভাবে মানুষ আজকের এই উন্নত সভ্যতার অধিকারী হ'ল ইতিহাসে রয়েছে তারই সত্য ও প্রামাণ্য বিবরণ। তাই ইতিহাস বলতে আমরা বুঝি অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য বিবরণ। ইতিহাস নিছক কল্প-কাহিনী নয়, **মানব সভ্যতার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার ধারাবাহিক অতীত বিবরণই ইতিহাস।**

ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা :—ইতিহাস মানব সভ্যতার দলিল। সুতরাং ইতিহাস না পড়লে অতীত সভ্যতা ও তার ক্রমবিকাশ জানতে পারা যায় না। আর তা না জানলে ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অতীতে ঘটে যাওয়া ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আগামী দিনের অগ্রগতির জন্য প্রস্তুত হতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে। ইতিহাস পড়লে আগামী দিনের নাগরিকরা দেশকে ভাল-বাসতে শিখবে। নিজেদের অতীতের গৌরবের ও উন্নতির কথা জেনে মন থেকে হীনমন্যতা দূর হয়ে আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে পরিচয় হয়ে নিজেদের দেশকে বিভিন্ন বিষয়ে আরও উন্নত করতে পারা যায়। ইতিহাস পড়লে অতীতের বহির্বিশ্বের সংগে সংযোগ ইত্যাদির বিবরণ জেনে মনের প্রসারতা বাড়ে এবং বিশ্বমানবতা বোধ জাগ্রত হয়। ইতিহাসে আছে কত সাম্রাজ্য ও জাতির উত্থান-পতনের কথা অহংকার ও অপরিণামদর্শিতার ফলে কত জাতি ও সভ্যতা হয়েছে ধ্বংস। ইতিহাস পড়লে ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া যায়। বহু দেশেরই অতীত গৌরবময় ইতিহাস আছে যেমন আমাদের দেশের সিন্ধুসভ্যতা, মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল ও সেন যুগের

ইতিহাস। এগুলি জানলে আমরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব এবং আরও উন্নত সভ্যতা গড়তে পারব, দেশকে ভালবাসতে পারব। মিশর, রোম, গ্রীস, এথেন্স, চীন এ সকল দেশের অতীত সভ্যতা সংস্কৃতি ও শাসন পদ্ধতির পরিচয় পেয়ে আমরাও দেশে তার চেয়ে উন্নত সভ্যতা গড়তে পারব।

(খ)

ইতিহাস রচনার উপাদান :—এখন মনে হতে পারে হাজার হাজার বছর আগের মানুষের জীবন যাত্রার এ সব বিবরণ কিরূপে জানা গেল? যুগ যুগ ধরে কত মানুষের প্রচেষ্টাতেই তা সম্ভব হয়েছে। সংগৃহীত অতীতের এ সকল উপাদানের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাস রচিত হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন :—বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায় মাটির নীচে থেকে বহু প্রাচীন নগর ও সভ্যতার চিহ্ন বেরিয়েছে। কোথাও পাওয়া গেছে অমসৃণ পাথরের তৈরী আদিম মানুষের অস্ত্রশস্ত্র, গুহা গাত্রে চিত্রিত অদ্ভুত জীবজন্তুর ছবি, কোথাও পাওয়া গেছে মাটি ও ধাতুর পাত্র, অলংকার ও শিল্প সামগ্রী। আবার কোথাও বেরিয়েছে অট্টালিকা, মন্দির ও উন্নত নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এমন কি কত বিচিত্র শীলমোহর, দেবদেবীর মূর্তি এবং বিচিত্র লিপিও পাওয়া গেছে।



মহেঞ্জোদাড়োর শীলমোহর

উপকথা ও ধর্মপুস্তক :—উপকথা ও ধর্মপুস্তক ইত্যাদি থেকেও প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ ও উপনিষদ ইলিয়ড, ওডেসী ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে সে যুগের মানুষের জীবন যাত্রার কথা জানা যায়। এগুলো শুধু নিছক গল্প বা উপকথা নয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন মানব সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থ নৈতিক জীবনের বৃত্তান্ত।

মুদ্রা :—প্রাচীন ইতিহাস জানার পক্ষে মুদ্রাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মুদ্রা থেকে সাল তারিখ রাজার নাম এমন কি সেই রাজার ধর্ম প্রবণতা ইত্যাদিও জানা যায়। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁর বীণা বাদনরত মূর্ত্তি ও যজ্ঞ অশ্বের চিত্র থেকে অনুমান করা যায় তিনি সঙ্গীত ভালবাসতেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। শশাঙ্কের মুদ্রায় শিবের চিত্র থেকে বুঝা যায় তিনি শিবের উপাসক ছিলেন।



অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মারক মুদ্রা

লিপি :—ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লিপি আর একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। এ সকল লিপি পাহাড়ে, মন্দির গাত্রে, স্তম্ভে খোদিত আছে। আবার প্রাচীন যুগে মানুষ পোড়া মাটির ফলকে, তালপাতায়, চামড়ায় এবং প্যাপাইরাস নামক এক প্রকার কাগজে সে যুগের বিভিন্ন খবর লিখে গেছেন। এরূপ বিভিন্ন ধরণের লিপি পাওয়া গেছে। এগুলোর কিছু কিছু বহু গবেষণার পর পণ্ডিতদের পক্ষে পড়া সম্ভব হয়েছে। এ সকল লিপি থেকে সে যুগের মানুষের নানারকম খবর আমরা জানতে পারি।

ইতিহাস রচনার এসব উপাদান থেকে নানা রকম রসায়নিক পরীক্ষা ইত্যাদির দ্বারা সময় কাল নির্ধারিত হয়েছে। খনন কার্য্যের ফলে প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী থেকে সে যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ যুগ যুগ ধরে বহু পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের দ্বারা আদিম অরণ্যচারী ও গুহামানুষের জীবন যাত্রার নিদর্শন খুঁজে বার করেছেন। সেই সব নিদর্শন থেকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণ করেছেন। আর ঐ সকল উপাদানের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে ইতিহাস।

প্রাচীনকে জানার এ প্রচেষ্টা আজও চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক অনেক বিষয় জানতে পারব। কত নতুন তথ্য হবে আবিষ্কৃত এবং রচিত হবে নব ইতিহাস।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস বলতে কি বুঝ ?

২। ইতিহাস পড়ার প্রয়োজনীয়তা কি ?

৩। একটি দেশের ইতিহাস রচনার জন্যে কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয় ?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী

১। নীচের প্রশ্নগুলির তিনটি করে উত্তর ডান দিকে দেওয়া আছে যেটি ঠিক সেটি প্রশ্নের সংগে জুড়ে ঐতিহাসিক সত্যটি সম্পূর্ণ কর :—

(ক) ইতিহাস পড়লে আমাদের -—প্রতিপত্তি বাড়ে, বিশ্বমানবতা বোধ জাগ্রত হয়, দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়।

(খ) প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপাদান——রূপ কথা, মুদ্রা, সরকারী দলিল।

২। নীচের ঐতিহাসিক সত্যগুলিতে ভুল আছে ঠিক করে লিখ ?

(ক) মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের যে সব পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে তাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

(খ) ইতিহাস পড়ে আমরা দেশের নদ-নদীর কথা জানতে পারি।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাই — ।

(খ) ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে—আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান।

৪। নীচের বিবরণগুলির মধ্যে কোন্ তথ্যটি ভুল তা বার কর :—

(ক) প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও মাটির নীচে থেকে পাওয়া নগর ও সভ্যতার চিহ্নকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে।

(খ) উপকথা ও ধর্মপুস্তক ইত্যাদির মধ্যে আর্য সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থ নৈতিক জীবনের বিবরণ আছে।

(গ) হর্ষবর্ধনের মুদ্রায় তাঁর বীণা বাদনরত মূর্তি থেকে অনুমান করা যায় তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানব

পৃথিবীর জন্মের পর কেটে গেল কোটি কোটি বছর। কত পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া হল অনুকূল। আবির্ভাব ঘটল জীবনের। প্রথমে সাগরের জলেতেই জীবনের সঞ্চার হ'ল। জন্ম নিল উদ্ভিদ। বহু বছর পরে আবির্ভাব ঘটল প্রাণীর। এদের মধ্যে অনেকের চেহারা ছিল অতিকায় ও ভয়াবহ। ক্রমে এই অতিকায় প্রাণী লোপ পেয়ে এলো স্তন্যপায়ী প্রাণী। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল মানুষ; আমাদের বর্তমান মানব গোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষ। তাদের আকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের মত ছিল না। গায়ে ছিল বড় বড় লোম, দেখতে অনেকটা বনমানুষের মত। মানুষ ও বনমানুষের একটা মাঝামাঝি ধরণের জীব। হাতে পায়ে ছিল বড় বড় নখ। মাথায় এখনকার মানুষের মত চুল ছিল না। চীন দেশের পিকিং নগরের পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে চুকুতিয়েন নামক একটি ছোট শহরের এক পাহাড়ের গুহায় প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর পূর্ব্বের এই জাতীয় আদিম মানুষের অস্থি কঙ্কাল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের পিকিং মানুষ বলা হয়। পিকিং মানুষ অবলুপ্ত আদিম প্লাইস্টোসিন মানব গোষ্ঠীর একটি শাখা। তা ছাড়াও পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্স ও স্পেনে ত্রিশ হাজার বছর আগেকার এ সব মানুষের অস্থি, কঙ্কাল ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদেরা এ সকল মানুষের নাম দিয়েছেন **নীয়েনডারথেল**। জাভাতেও প্রাচীন মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেছে।



নিয়েনডারথেল

আদিম মানুষের জীবন যাত্রাঃ—এই আদিম মানুষ প্রথমে বনে

জঙ্গলে বাস করত। ঘর বাড়ী তৈরী করতে জানত না। জন্তু জানোয়ার শিকার করে তারা কাঁচা মাংস খেত। আগুন জ্বালতে জানত না। চাষ আবাদের কথা তো কল্পনাই করা যায় না। অনেকটা জন্তু জানোয়ারের মত জীবন যাপন করত।

বাঁচার প্রয়োজনে আদিম মানুষেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করতে লাগল। তারা দলবদ্ধ ভাবে শিকার করতে যেত।

খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ :—মানব সভ্যতার বিকাশের শৈশবে মানুষ ছিল সভ্যতার সংগে সম্পর্ক শূন্য। তখন মানুষ যাযাবরের মত জীবন যাপন করত। প্রকৃতির স্বাভাবিক পথে উৎপন্ন বনের ফলমূল, কন্দ, ভোজ্য উদ্ভিদ, ফসল, বন্যজীবজন্তু, পশুপক্ষীর মাংস, জলজ প্রাণী ও মাছ সংগ্রহ করে জীবন যাপন করত। চাষ আবাদ ও পশুপালন করতে জানত না। ফলে এক স্থানের খাদ্য সামগ্রী ফুরিয়ে গেলে অন্যস্থানে চলে যেত। তাঁরা বনে জঙ্গলে পশুর মত জীবন যাপন করত ; না ছিল স্থায়ী আবাস স্থল না ছিল নির্দ্দিষ্ট খাদ্য।

আগুনের ব্যবহার —এই আদিম মানুষ প্রথমে আগুন জ্বালতে জানতো না। শিকার করা জীবজন্তুর মাংস কাঁচা খেত। পৃথিবীর কোন্ অংশে কখন কিভাবে যে আগুন জ্বালার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেন নি। হয়তো স্বাভাবিক কারণে বনে দাবানলের আগুন থেকে অথবা বজ্রের পতনে জ্বলে ওঠা আগুন থেকে বা পাথরের ঘর্ষণের ফলেই আগুন প্রথম মানুষের জ্ঞানের গোচর হয়। খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ৩০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে **"পিকিং মানুষ"** নামক মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রথম আগুনের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। চুকুতিয়েন গুহায় এদের অস্থি ইত্যাদির চিহ্নের সংগে আগুন জ্বালার চিহ্নও দেখা গেছে। আগুনের ব্যবহারের সংগে সংগে মানব সভ্যতা অগ্রগতির এক সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছিল।

পুরাতন প্রস্তর যুগ :—আদিম মানুষকে হিংস্র ম্যামথ প্রভৃতি বিশালদেহী হিংস্র জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সংগে সর্বদা যুদ্ধ

করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে হ'ত। এই জীবজন্তুদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রধান অস্ত্র ছিল তাদের দুটি হাত, পাথরের টুকরা আর বন জঙ্গলের ডাল বা কাঠের টুকরো। এ অস্ত্র দিয়ে তারা জীবজন্তু শিকার করে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। ক্রমে অস্ত্র হিসাবে তারা নানান পাথরের টুকরাকে বেছেনিল। পাথরের টুকরার মধ্যে ভারী সূঁচাল ধরণের গুলি এই কাজের পক্ষে অধিক উপযোগী ছিল। এই ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করতে করতে তারা এখনকার ধাতুর অস্ত্রের মত ফলা বিশিষ্ট পাথর সংগ্রহ করল যেগুলিকে ছোঁড়া অনেক সুবিধাজনক ছিল। তবে এই সকল পাথরের অস্ত্রগুলি ছিল অমসৃণ খস্‌খসে্ এবং প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্ট স্বাভাবিক আকৃতি সম্পন্ন। এগুলি ভেঙ্গে বা ঘষে কাজের উপযোগী অস্ত্রে রূপ দেওয়ার মত বুদ্ধি বা দক্ষতা তখনকার মানুষের ছিল না। নানা স্থান থেকে সেগুলিকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করতেই পারত। এই যুগকে ঐতিহাসিকেরা নাম দিয়েছেন **পুরাতন প্রস্তর যুগ**। আর এই অস্ত্র গুলিকে বলা হয় **পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র**।



পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

এই জাতীয় পাথরে অস্ত্রশস্ত্র পৃথিবীর বহু স্থানে মাটির নীচে থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। দলবদ্ধ ভাবে বা একা আদিম মানুষেরা এই সকল টুকরার দ্বারা জীবজন্তু শিকার করত। এই ভাবে খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ খাদ্য উৎপাদকে রূপান্তরিত হয়।

নূতন প্রস্তর যুগ

সভ্যতার ক্রম বিকাশের সংগে সংগে জীবন যাত্রার প্রয়োজনে আদিম মানুষ পাথরের টুকরার অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে লাগল। এই সব অমসৃণ পাথরের টুকরাগুলিকে

পাথরে ঘষে প্রথমে তারা একটু মসৃণ করে নিল। তারপর নানা আকৃতি দিতে লাগল। অস্ত্রের উপযোগী পাথরের টুকরা সংগ্রহ করে সেগুলোকে কুঠার, টাঙ্গি, বল্লম, ইত্যাদির ধরণে তৈরী করে নিল। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে তারা গাছের ডাল এসব পাথরের মাঝে গর্ত্তকরে হাতলের মত পরিয়ে নিল। এসকল অস্ত্রশস্ত্র প্রাচীন প্রস্তর যুগের অস্ত্র অপেক্ষা সুআকৃতির, চিক্কণ, মসৃণ ও ধারাল।



নূতন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

এই যুগকে বলে **নূতন প্রস্তর যুগ** এবং অস্ত্রগুলিকে বলা হয় **নূতন প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র**।

খাদ্য উৎপাদন ঃ—গুহা বা কুটীরের পাশে স্বাভাবিক ভাবে গজিয়ে ওঠা যব, গম ইত্যাদি ফসলের বীজ থেকে তারা তাদের বাসস্থানের আশে পাশে সেই বীজ ছড়িয়ে দিয়ে চাষ আবাদ করা শিখল। খাদ্য সংগ্রহকারী যাযাবরী মানুষ স্থায়ী বসবাসকারী সামাজিক মানুষের রূপ নিল।

নূতন প্রস্তর যুগের অগ্রগতি

পশুপালন ঃ—শুধু ফসল ফলানই নয় তারা বন থেকে জন্তু জানোয়ারকে ধরে এনে তাকে পোষ মানিয়ে জীবন যাত্রার নানা প্রয়োজনে লাগাতে লাগল। গরু, মহিষ, ঘোড়া এগুলিকে চাষ আবাদ করা, মালবহন এবং যানবাহন হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল। তাছাড়া দুধ ও মাংস গৃহপালিত জন্তুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। এর ফলে খাদ্য সংগ্রহের অনিশ্চয়তা অনেক দূর হল। শিকারের কাজে তারা ঘোড়া ও কুকুরকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে, শিকার করাও অনেক সহজসাধ্য হয়ে গেল। প্রাচীন গুহা গাত্রে চিত্রিত মানুষের শিকারের সঙ্গী কুকুরের চিত্রই এর প্রমাণ। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষ গৃহপালিত জন্তুচালিত যানবাহনও আবিষ্কার করে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে।

মৃৎপাত্রাদি নির্মাণ :—আগুনের আবিষ্কারের সংগে সংগে মানুষের জীবন যাত্রায় আসে আমূল পরিবর্তন। কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী মানুষ রান্না করা খাবার খেতে আরম্ভ করে, তার ফলে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন বাসন পত্রের। প্রথমে পাথরকে চেঁছে-কেটে প্রয়োজনের উপযুক্ত পাত্র তৈরী করে। চামড়া, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির টুকরা থেকেও পাত্র তৈরী করে ব্যবহার করতে থাকে। এখনও আসাম, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁশের তৈরী জিনিষপত্রের ব্যবহার দেখা যায়। পাথর, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি থেকে পাত্র তৈরী করাও শ্রমসাধ্য ছিল। তাছাড়া অগুনে গলানও অসুবিধা জনক ছিল। তাই সে যুগের মানুষেরা ক্রমে নরম মাটি দিয়ে প্রয়োজনের উপযুক্ত নানান বাসন পত্র তৈরী করে স্থায়িত্বের জন্য তাকে আগুনে পুড়িয়ে নিতে শিখল। পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে পুরানো সমস্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু রকম মৃৎপাত্রাদি নিদর্শন দেখা গেছে। প্রাচীন মানুষেরা কুমোরের চাক আবিষ্কার করে মৃৎশিল্পকে দ্রুতগতি যুক্ত ও উন্নত করে তুলেছিল।

বস্ত্রবয়ন :—আদিম অবস্থায় মানুষ গাছের ছাল, পাতা ও জন্তু জানোয়ারের চামড়া ইত্যাদি পরত। ক্রমে তারা জন্তু জানোয়ারের লোম পাকিয়ে সুতো তৈরী করে এবং সেই সুতো দিয়ে পোষাক তৈরী করতে শিখলো। এই পোষাকগুলি ব্যবহার করে দেখল শীত থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায় এবং পরেও আরাম হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে তারা নানান তন্তু যেমন রেশম ইত্যাদি থেকে সুতো বের করে মোটা কাঠের স্ূঁচ দিয়ে খুঁটি পুঁতে তাঁতের মত তৈরী করে কাপড় বুনতে লাগল। পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে আজও সেই জাতীয় বয়ন পদ্ধতির উন্নত সংস্করণ দেখা যায়। ক্রমে কার্পাস থেকে সুতো তৈরী করতে শিখলো এবং সুতীবস্ত্রের ব্যবহার শুরু হল। মিশর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধুসভ্যতায় রেশম ও পশম বস্ত্রের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

বাসস্থান :—আদিম বন্য মানুষ গাছের ডালে পাহাড়ের গুহায় বাস করত। তার পরবর্তী যুগের মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় কিছু মানুষ হ্রদের মাঝে কুঁড়ে ঘর তৈরী করে বাস করত।

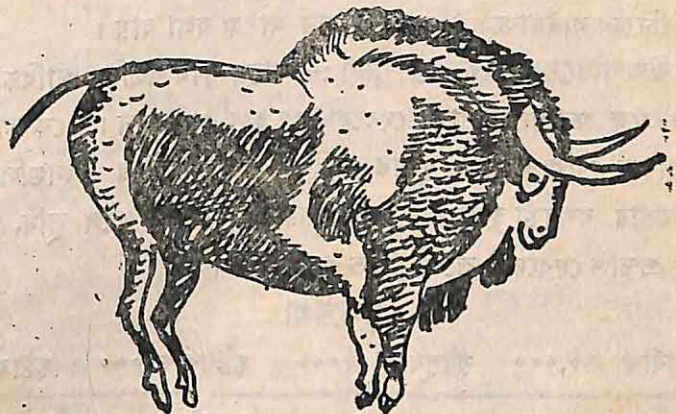
ইউরোপের কাস্পিয়ান হ্রদের নিকট এরূপ হ্রদমানুষের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। আরও কিছু মানুষ গুহা ছেড়ে পাহাড়ের টুকরা সাজিয়ে সাজিয়ে ছোট ছোট ঘর বানাতে লাগল। এ ঘর হল অনেক সুরক্ষিত ও আরামপ্রদ। কোন কোন অংশে মানুষ জীবজন্তর চামড়ার তাঁবুতে বাস করতে লাগল। বন জঙ্গল পরিষ্কার করে দলবদ্ধ ভাবে বাস করতে লাগল। গড়ে উঠলো গ্রাম, জনপদ। নিজ বাসস্থানকে সুরক্ষিত করার জন্য বাস গৃহের সামনে দরজা, প্রাচীর ইত্যাদির প্রচলন শুরু হল। শুধু বন্য জন্তু জানোয়ার নয় শত্রুদলের আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য পাথর বা কাঠের প্রাচীর দিয়ে জনপদকে সুরক্ষিত করল।

যানবাহন:—জন্তু জানোয়ারকে পোষ মানানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্য কেবলমাত্র পশুই নয়, পশুচালিত গাড়ী ইত্যাদিও তৈরী করল। প্রথমে অবশ্য কয়েক খণ্ড কাঠ জুড়ে ভেলার মত করে তার সাহায্যে নদী পথেই যাতায়াত হত এবং ডাঙ্গাপথে চাকাবিহীন পশুচালিত যান ব্যবহৃত হত। কাঠের লম্বা গুঁড়িকে কাঠের তক্তার তলায় লাগিয়ে জন্তু-জানোয়ারদের দ্বারা টেনে নিয়ে যাওয়া হত। সেই গোল কাঠটি চাকার মত ঘুরে যানটিকে এগিয়ে নিয়ে যেত। সেইঘূর্ণায়মান কাষ্ঠখণ্ড থেকেই মানুষ চাকা আবিষ্কার করল। চাকা আবিষ্কারের ফলে শুধু যানবাহন নয় মানব সভ্যতা এক লাফে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল।

মানুষের সামাজিক জীবনের বিকাশ:—দলবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রয়োজনেই মানুষ সমাজ গড়ল। তাদের মধ্যে একজন শক্তিমান ব্যক্তিকে দলপতি বা সমাজপতি করল। সেই সমাজপতি দল বা সমাজকে নানা বিপদ-আপদ ও বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে লাগল। ক্রমে সেই পদ রাজপদে রূপান্তরিত হল। সংঘবদ্ধ ভাবে বাস করার প্রয়োজনে মানুষ এক জায়গায় বাড়ীঘর তৈরী করে বাস করতে লাগল। গ্রাম, নগর, রাজ্য, রাজধানী গঠিত হল।

ধর্ম বিশ্বাস:—মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও বিভিন্ন দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রধানতঃ অজ্ঞতা ও ভয় থেকে। আদিম মানুষ বজ্রপাত, ভূমিকম্প,

ঝড়, বৃষ্টি, ইত্যাদিকে অজ্ঞতা হেতু ভয় পেতে থাকত। তা থেকে বাঁচার জন্য ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাককে শান্ত করার জন্য পূজা করত।



আলতামিরা গুহায় অঙ্কিত চিত্র

আবার বৃষ্টি, সূর্য্য, আগুন, মাটি ইত্যাদির কাছথেকে উপকার পেত বলে কৃতজ্ঞতাবোধে তাদেরও দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করত। অনেক জন্তু-জানোয়ারকেও তারা দেবদেবী জ্ঞানে পূজা করত।

শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধ :—আদিম মানুষের মনে ক্রমে সৌন্দর্য্য-বোধ জাগতে লাগল। তারা জন্তুর হাড় দিয়ে মালা তৈরী করে পরত। তার উপর নানান কারুকার্য্য করত। পাখীর পালককে সাজিয়ে মাথায় পরত। পাথরের সূঁচ দিয়ে গুহার গায়ে শিকার ও নানান বন্য জন্তুর ছবি আঁকত। তাদের অঙ্কিত ছবি স্পেনে আলতামিরা ইত্যাদি গুহাগাত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে। ঝিনুক, শাঁখ ইত্যাদির মালা তৈরী করে পরত। হাড় ও পাথর খোদাই করে নানান মূর্ত্তি তৈরী করত।

ভাষার জন্ম :—প্রথমে মানুষ আকারে ইঙ্গিতে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত চীৎকার ও শব্দ করে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করত। এই শব্দ ও ধ্বনিই ক্রমবিকাশের ধারায় ভাষায় রূপ পায়। তারা পাথরের সূঁচ দিয়ে গুহার গাত্রে ছবি আঁকত। শুধু ছবি আঁকা নয় ছবির সাহায্যে বক্তব্য প্রেরণ করত। তারপর সেই ছবিকে সংক্ষেপে আঁকতে

লাগল এবং সেই সংক্ষিপ্ত ছবিই কালে পরিবর্ত্তিত হয়ে বর্ণের রূপ নিল। তাছাড়া বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করে নিজেদের পরিচয় দিত। এই চিহ্নের ব্যবহারকেই লেখা শেখার আরম্ভ বলা যায়।

উৎপাদনের দেবতার পূজা :—মানুষ কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপাস্য দেবদেবীরও হল পরিবর্ত্তন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে পূজার পরিবর্ত্তে উৎপাদনের উৎসগুলিকেও কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হয়ে তারা পূজা করতে লাগল ; ফলে ভূমি, মেঘ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবদেবী রূপে পূজিত হতে লাগল।

যুগরেখা

খৃষ্টপূর্বাব্দ ১০,০০০	খৃষ্টপূর্বাব্দ ৫০০০	খৃষ্টপূর্বাব্দ ০০০	খৃষ্টাব্দ ০
পুরাতন প্রস্তর যুগ	নূতন প্রস্তর যুগ	তাম্র যুগ	লৌহ যুগ

অনুশীলনী

১। আদিম মানুষ দেখতে কেমন ছিল? আনুমানিক কতদিন পূর্বে কোন জায়গায় মানুষ প্রথম আগুন জালাতে শেখে?

২। আদিম অবস্থায় মানুষ কি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত?

৩। কোন্ সময়কে পুরাতন প্রস্তর যুগ বলা হয়।

৪। নূতন প্রস্তর যুগের সময় কাল নির্ণয় কর।

৫। বস্ত্র আবিষ্কারের আগে মানুষ কি পরত?

৬। কিভাবে গ্রাম গড়ে উঠল।

৭। প্রধানতঃ কি থেকে আদিম মানুষের মধ্যে ধর্ম বিশ্বাস জাগে?

৮। আদিম মানুষের শিল্পবোধের পরিচয় কোন্ ঐতিহাসিক উপাদান থেকে পাওয়া যায়?

৯। লিপির জন্ম কি থেকে হয়েছে?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী

১। নীচে দুটি করে ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া আছে যেটি ঠিক সেটি লিখ।

(ক) (১) নূতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা পশুপালন করতে জানত।
(২) পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষেরা চাষ আবাদ করত।

(খ) (১) মানুষ প্রথমে কার্পাসের বস্ত্র তৈরী করে।
(২) মানুষ প্রথমে পশমের বস্ত্র তৈরী করে।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর ডানদিকে এক সঙ্গে দেওয়া আছে যেটি যার উত্তর বেছে প্রশ্নের সঙ্গে লিখ।

(ক) হ্রদমানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে কোথায় ?	(ক) কৃতজ্ঞতারূপ মানসিক বৃত্তি থেকে।
(খ) কোন্ মানসিক বৃত্তিটি থেকে মানুষ বৃষ্টি, সূর্য্য, আগুন, মাটি ইত্যাদি পূজা করতে লাগল ?	(খ) কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে।
(গ) আদিম মানুষের শিকার ও নানান বন্য জন্তুর ছবি কোথায় অঙ্কিত আছে ?	(গ) আলতামিরা গুহায়।
(ঘ) প্রথম আগুন জ্বালতে শেখে কোন্ মানব গোষ্ঠী ?	(ঘ) ফ্রান্স ও স্পেন।
(ঙ) যে যুগে মানুষ পাথরকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত তাকে কি যুগ বলে ?	(ঙ) পিকিং মানব।
(চ) ত্রিশ হাজার বৎসরের পুরাতন মানুষের অস্থি কঙ্কাল কোথায় পাওয়া গেছে ?	(চ) পুরাতন প্রস্তর যুগ।

৩। শূন্যস্থানে উপযুক্ত ঐতিহাসিক শব্দদ্বারা পূর্ণ কর।

(ক) ধ্বনিই ক্রমবিকাশের ধারায় — রূপ নেয়।

(খ) দলবদ্ধ হয়ে বাসের প্রয়োজনেই মানুষ — গড়ল।

(গ) জন্তু জানোয়ার ও শত্রুদলের আক্রমণ থেকে — জন্য প্রাচীর দিয়ে জনপদকে সুরক্ষিত করে।

(ঘ) — যুগের অস্ত্রগুলি ছিল অমসৃণ, থসথসে ও প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্ট স্বাভাবিক আকৃতি সম্পন্ন।

(ঙ) — ব্যবহারের সংগে সংগেই মানব সভ্যতা অগ্রগতির এক সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেছিল।

৪। নীচের মানব গোষ্ঠীকে সময়ের ক্রম অনুসারে অতীত থেকে বর্তমানে সাজাও :—নূতন প্রস্তর যুগের মানুষ, নীয়েনডারথেল মানব, হ্রদমানব, পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ।

তৃতীয় অধ্যায়
তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

আদিম মানুষ পাহাড়ে, পর্বতে, বনে, জঙ্গলে ঘুরত ; গাছের ডালে বা গুহায় বাস করত। তাদের জীবন ছিল ছন্নছাড়া। জীবন ছিল অনেকটা জন্তু জানোয়ারের মত। প্রয়োজনও ছিল খুব অল্প। ক্রমে তারা বুঝলো দলবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধা অনেক। একসঙ্গে বাস করলে খাদ্য সংগ্রহ যেমন সহজ, তেমনি একে অপরের সাহায্যেও লাগতে পারে। তাই আত্মরক্ষা ও জীবন যাত্রা নির্বাহের নিশ্চয়তার জন্য মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করল। তখন তারা ঘর বাড়ী তৈরী করতে জানত না। পাথরের গুহায় ও ঝোপে-জঙ্গলে থাকতে থাকতে পাথরের টুকরো এলোমেলো ভাবে সাজিয়ে ছোট খাট অগোছাল একটা আস্তানা তৈরী করতে শিখল। গাছের ডালপালা ও পাতা দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের মত তৈরী করে তাতে বাস করতে লাগল।

সভ্যতার প্রবণতা :—মানব সভ্যতা এগিয়ে চলল। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে বাসগৃহে উন্নত ও সুদৃশ্য রূপ নিতে আরম্ভ করে। তাই তারা দেখল নদীর ধারে বাস করাই সুবিধা জনক। নদীতীরবর্ত্তী উর্বরা ভূমিখণ্ডে একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে আরম্ভ করল সভ্যতা প্রয়াসী মানবকূল। গড়ে উঠল ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামের পাশের পতিত জমিকে তারা চাষ আবাদের ও পশুচারণের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তখন বন-জঙ্গল ছিল প্রচুর। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব ছিল অনেক বেশী। আর তাছাড়া বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি হত। সেই জন্য অন্য দল বা শত্রু এবং বন্যজন্তু ইত্যাদির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গ্রামের চার পাশে দেওয়াল দিয়ে পরিখা খনন করে বা বেড়া

দিয়ে আবাস স্থানকে সুরক্ষিত করল। ক্রমে সভ্যতা উন্নতির পথে আরও এগিয়ে চলে। মানুষও সঙ্ঘবদ্ধ, স্থায়ী বসবাসের সুবিধা বুঝল। সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ও জীবিকার জন্য তারা নানা জিনিষ আবিষ্কার করল। বাস গৃহগুলিকে উন্নত করল যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা ঘাট তৈরী করল। সভ্যতা বিকাশ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট গ্রাম বড় গ্রামে এবং শহরে পরিণত হল। প্রথম অবস্থায় এইসব শহর সুপরিকল্পিত ছিল না। ক্রমে সুপরিকল্পিত নগর স্থাপত্যের সরণীতে মানব সভ্যতা অগ্রয়ান হল। মাটি দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করতে শেখার আগেই মানুষ মাটি দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে শেখে। কিন্তু প্রথমে মাটির ইট তৈরী করতে পারত না। মাটির বিভিন্ন ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র তৈরী করতে করতে তারা মাটির ইটও তৈরী করল এবং সেগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে বা কাঁচা ইট দিয়ে বাড়ী, রাস্তাঘাট, উপাসনা গৃহ ইত্যাদি তৈরী করল। মেসোপটেমিয়া মিশর, সিন্ধুসভ্যতা ইত্যাদি সবকটি অতি প্রাচীন সভ্যতাতেই পোড়া ইটের তৈরী বাড়ী ঘরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

কৃষি পদ্ধতির জন্ম :—গ্রাম ও নগর গড়ে বাস করা শুরু করতেই মানব জাতির একটি বিরাট অংশের যাযাবরী জীবন শেষ হয়ে স্থায়ী সামাজিক জীবনের সূত্রপাত হল। খাদ্যের প্রয়োজনের জন্য বনে জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার শিকার করে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার চেয়ে বাসস্থানের কাছেই খাদ্য উৎপাদন করাই মানুষ অনেক সহজ ও নিশ্চিন্ত বলে বুঝল। বনে জঙ্গলে নিজে হোতে জন্মান গাছপালা থেকে ফল-মূল বা শস্য সংগ্রহ করার বা বাসস্থানের পাশে উদ্বৃত্ত বীজ ছড়িয়ে দিয়ে ফসল সংগ্রহ করার জন্য অপেক্ষা না করে বীজ বপন করতে লাগল। তারা দেখল একটু যত্ন করে মাটি খুঁড়ে নরম করে তাতে বীজ ছড়ালে অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায়। জন্ম নিল কৃষি পদ্ধতি। কৃষির মধ্যে গম ও বার্লির চাষ সবচেয়ে প্রাচীন। পরে শুরু হয় ধানের। প্রথমে নিজেরাই মাটি খুঁড়ে তাতে বীজ

ছড়িয়ে দিতে লাগল। তারপর গৃহপালিত গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদির সাহায্যে কাঠের লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে লাগল। কিন্তু শক্ত মাটিকে খুঁড়ে নরম করতে প্রয়োজন ধাতুর ফলকের তাই লাঙ্গলও চাষের অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরী করল তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে। বিভিন্ন ফসলের বীজ সংগ্রহ করে চাষ করতে লাগল এবং আগামী বৎসরের জন্য বীজ সঞ্চয় করতে লাগল। ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের পদ্ধতি বুঝল। ঝাড়াই-মাড়াই ইত্যাদি পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করল।

কৃষি ও কারু জীবি সম্প্রদায়ের উদ্ভব :—উন্নত সভ্য জীবনে মানুষের প্রয়োজনও বাড়ল। জীবন যাত্রার প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করল। আদিম মানুষের মত মানুষ তার নিজের প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিষই নিজে তৈরী করার চেষ্টা করল না। যে ভাল হাঁড়ি গড়ে সকলে তার কাছে হাঁড়ি নিতে লাগল, আবর যে ভাল কাঠের জিনিষ তৈরী করতে পারত সে কাঠের জিনিষ সরবরাহ করতে লাগল। চাষবাস বিষয়ে দক্ষ লোকেরা কৃষি কর্মে আত্মনিয়োগ করল, বয়ন কর্মে দক্ষ যারা তারা কাপড় বুনতে লাগল। এইরূপে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন পেশার সৃষ্টি হল এবং পেশার বিভাগের ফলে কামার, কুমোর, ছুতার, তাঁতী সকলেই নিজ নিজ কাজে বেশী পটু হয়ে উঠল। লোহা ছাড়া শিখল নানান ধাতুর ব্যবহার। তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী করল এবং তা দিয়ে নানান প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করতে লাগল।

বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য :—পেশার বিভাগের সংগে সংগে বিনিময় প্রথা শুরু হয়। কুমোরের তৈরী হাঁড়ি নেবার সময় কামার তাকে দিত তার তৈরী কোন মাটি কাটার ধাতুর অস্ত্র ; আবার চাষী তার উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে তাঁতীর কাছ থেকে নিত কাপড়। এই ভাবে সমাজে শুরু হল ব্যবসা বা বেচা কেনা। তবে সে যুগে অর্থের বিনিময়ে এই ব্যবসা চলত না, চলত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরস্পর বিনিময় পদ্ধতিতে। এই বিনিময় ব্যবস্থা প্রথম স্তরে এক একটি

দল বা সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সমাজে তাদের প্রয়োজন মত সামগ্রীই উৎপন্ন হত এবং বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যোগ্যতা বৃদ্ধি ও উন্নত পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন কোন একটি নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর বাইরেও উদ্বৃত্ত সামগ্রী তাদের প্রয়োজনে দেওয়া শুরু হল। বেচা কেনা ব্যবসার পর্য্যায়ে উন্নীত হল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভবে সমাজ জীবনে পরিবর্ত্তন :—কৃষি ও বিভিন্ন কারুজীবি সম্প্রদায়ের উদ্ভবে মানুষের জীবন যাত্রার এক নূতন গতিবেগ এলো ; পরিবর্ত্তন হল সমাজ জীবনের। বিভিন্ন কর্মে দক্ষতা সম্পন্ন মানুষেরা কর্ম ও পেশা মত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হল এবং বংশানুক্রমিক পেশা হিসাবে গ্রহণ করল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারেও এক শ্রেণীর লোক ব্যবসাকে জীবিকা উপার্জনের পথ হিসাবে নিল। এই ভাবে সমাজ জীবনে এলো পেশা ও বৃত্তিগত শ্রেণী বিভাগ, ধন বৈষম্য ও শ্রেণী বৈষম্যের বীজ হল অঙ্কুরিত।

বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব :—গ্রাম ও নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই আদিম মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বাস করত। দলবদ্ধ হয়ে খাদ্য সংগ্রহে বের হত বসবাসের স্থান ও খাদ্যের অধিকার নিয়ে, বিভিন্ন দলের ও পরবর্তী কালে বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি হত। পরবর্তী কালে মানব সভ্যতা গ্রাম ও নগরে কেন্দ্রীভূত হয়। নগর সভ্যতার যুগে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপজাতিদের মধ্যে সম্পদের অধিকার নিয়ে চলে বিরোধ ও মারামারি।

শিশু রাষ্ট্রের উদ্ভব :—সংঘবদ্ধ মানুষ নিজ নিজ স্বার্থে বিশেষ করে খাদ্য সংগ্রহ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে এক সংগে বসবাস শুরু করল, সূচনা হল সমাজ জীবনের। নিজেদের মধ্য থেকে একজন শক্তিশালী লোককে বেছে নিয়ে তারা তাদের দলপতি করল। তার উপর দিল প্রতিরক্ষা, শান্তি, শৃঙ্খলা, সামাজিক জীবনের নানারকম জটিল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব। এই দলপতি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদেরও

মীমাংসা করত। দল বা গোষ্ঠীকে আদেশ ও নির্দেশ দিত। তারাও তার কথা মেনে চলত। রুশো তাঁর "সোস্যাল কনট্রাক্ট থিয়োরীতে" বলেছেন মানুষ নিজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়েছে। এই দলপতিই ক্রমে আরও শক্তিশালী হল। প্রতিরক্ষার জন্য গড়ল সৈন্যদল। বিশেষতঃ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সৈন্যদল ও প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনকে অধিক প্রয়োজনীয় করে তুলল। ক্রমে দল বা গোষ্ঠীর দলপতি আরও শক্তি সঞ্চয় করল। সৃষ্টি হল রাজপদ। তখন রাজতন্ত্রের জন্ম হলেও রাজার জীবনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খুব একটা তফাৎ ছিল না। রাজাও সাধারণ মানুষের মত সব কিছু কাজকর্ম করতেন। তবে যুদ্ধের সময় তাঁকে সৈন্য চালনা করতে হত। রাজার ছেলেই যে তারপর রাজা হবে এরকম কোন নিয়ম ছিল না। বিভিন্ন উপজাতির অধিকৃত অঞ্চল বিজয় করে অধিকারের সীমানা করল বর্দ্ধিত। ক্ষুদ্র জনপদ হল রাজ্যে রূপান্তরিত। ধীরে ধীরে রাজ্য শাসনের প্রাথমিক আইন কানুন তৈরী হল। জন্ম নিল **শিশু রাষ্ট্র**।

নদী উপত্যকায় সভ্যতা বিকাশের কারণ :—পৃথিবীর জলভাগেই যেমন প্রথম জীবনের সঞ্চার, তেমনই সভ্যতার আরম্ভও বড় বড় নদীর তীরে। তার কারণ উর্ব্বরতার জন্য নদী তীরের জমিতে ভাল ফসল ফলে, চাষের জলের অভাব হয় না, ডাঙ্গায় যখন যাতায়াতের পথ ছিল না, তখন নদী পথে যাতায়াতের সুবিধা ও নদীর তীরে সভ্যতা গড়ার, শত্রু আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ সুবিধা। তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাই গড়ে উঠে কোন না কোন নদীকে কেন্দ্র করে।

অনুশীলনী

১। মানুষের যাযাবরী জীবনের অবসান ঘটল কখন ?
২। তাম্রযুগের মানুষের কৃষি কার্য্যের সম্বন্ধে যা জান লিখ ?
৩। সভ্যতা বিকাশের প্রথম পর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত কিরূপে ?
৪। শিশু রাষ্ট্রের উদ্ভব হ'ল কিরূপে ?
৫। নদী উপত্যকায় সভ্যতা বিকাশের নগরগুলি আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী

১। নীচের ঐতিহাসিক তথ্য গুলিতে ভুল আছে ঠিক করে লিখ।

(ক) তাম্রযুগে মানুষ গুহায় বাস করত।

(খ) তাম্রযুগে মানুষ লোহার ফলাযুক্ত লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করত।

(গ) জঙ্গলে ঘুরে একসঙ্গে পশু শিকার করার সময়ই রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

২। পাশে অনেকগুলি উত্তর দেওয়া আছে যেটি যে প্রশ্নের ঠিক উত্তর সেটি সেই প্রাশ্নর কাছে লিখ ?

(ক) কোন্ যুগে মানুষ কৃষিকর্ম শেখে ? (খ) মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করে কেন ? (গ) বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় কখন ?	আত্মরক্ষা ও খাদ্যের প্রয়োজনে, তাম্রযুগে, গ্রাম ও নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা বিকাশের পূর্বে।

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

— উর্ব্বর ভূমি খণ্ডে প্রাচীন মানুষ বসবাস শুরু করে।

— বিভাগের ফলে কামার, কুমোর, ছুতার, তাঁতী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের জন্ম হল।

ক্রমে বিভিন্ন দলের দলপতি — রূপান্তরিত হল।

৪। সময়ের ক্রম অনুসারে সাজাও :—

তাম্রযুগ, অমসৃন পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, আগুনের ব্যবহার।

৫। পাশে দুটি করে উত্তর দেওয়া আছে, যেটি ঠিক তার পাশে (√) টিক চিহ্ন দাও।

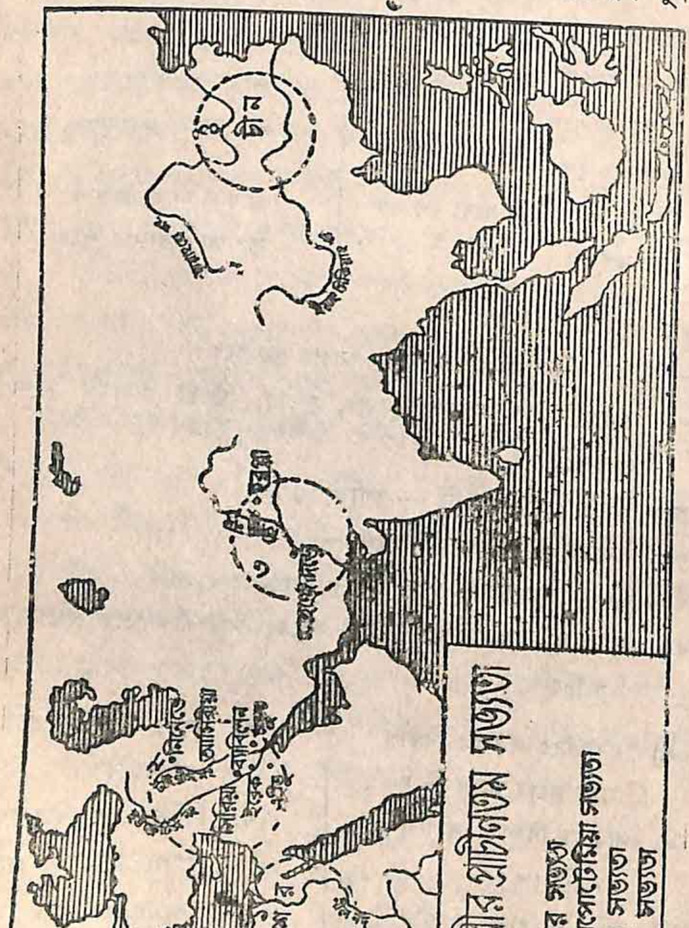
(ক) নদীতীরে সভ্যতা বিকাশ লাভ করার কারণ কি ? (খ) বৃত্তিগত বিভাগ সমাজে এল কিরূপে ? (গ) পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাই গড়ে উঠেছে ?	ক) ভূমির উর্ব্বরতা, প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। (খ) বিভিন্ন পেশা বংশানুক্রমিক পেশা হিসাবে প্রচলনে, অর্থের প্রয়োজনে। (গ) সমুদ্রকে কেন্দ্র করে, নদীকে কেন্দ্র করে।

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতা

(খৃঃ পূঃ ৩০০০-১৫০০ অব্দের মধ্যে)

আদিম অবস্থা থেকে মানব সভ্যতার পরিবর্তন হয়েছিল খুব ধীরে



ধীরে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও পরিবর্তন এসেছে

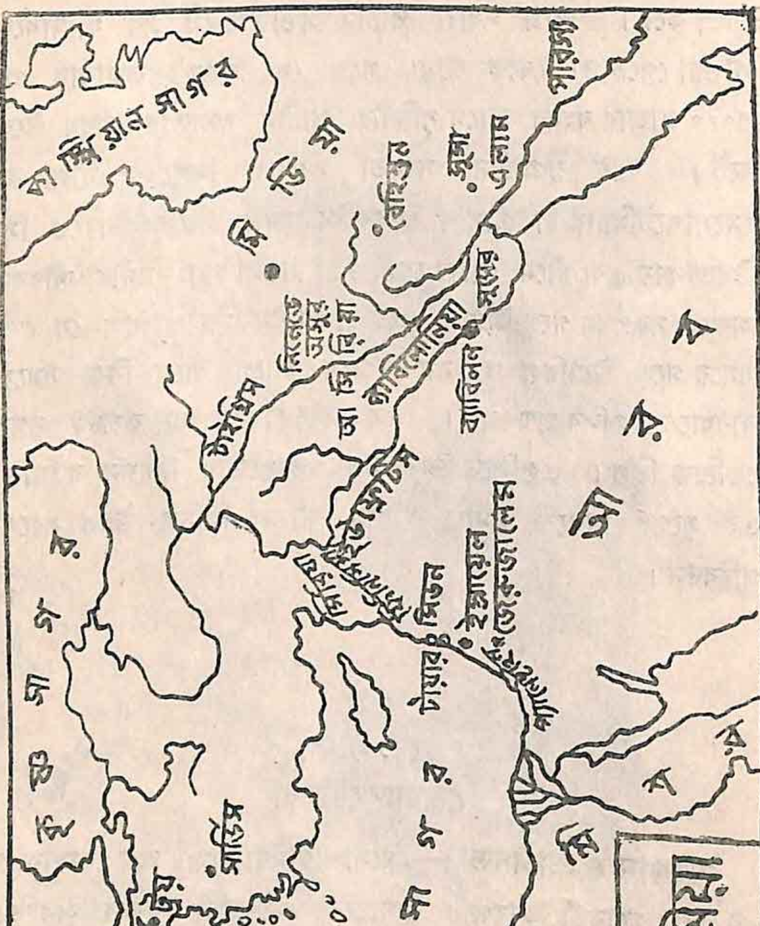
একটু আগে আবার কোথাও কিছু পরে। পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির সব কয়টিই গড়ে উঠে কোন না কোন নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করে। আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেছে যে যিশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় ৪০০০ হাজার বৎসর আগে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে। এই সুপ্রাচীন সভ্যতা সম্ভবতঃ মিশরের নীল নদ, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে, ভারতে সিন্ধু উপত্যকায় এবং চীনে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সর্বপ্রথম গড়ে উঠে। এই সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি যে একই সময়ে গড়ে উঠেছিল তা নয়। তবে আগে পিছে কিছু সময়ের ব্যবধানে এগুলির জন্ম হয়। এই সভ্যতাগুলি সব কয়টিই নগর-কেন্দ্রিক ছিল। এগুলিতে উন্নত নগর স্থাপত্যের নিদর্শন বর্তমান। এই যুগের মানুষের সমাজ জীবনে আনল বিচিত্র উন্নত ধরণের পরিবর্তন।

(১)

মেসোপটেমিয়া

অবস্থান ও প্রাচীনতা :—মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ দোয়াব বা দুটি নদীর মধ্যবর্তী জায়গা। আরবের মরুভূমির উত্তরে অবস্থিত টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস এই দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে দোয়াবে গড়ে উঠে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা। এই দোয়াবের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে সুমের, মধ্যভাগে ব্যাবিলন এবং উত্তর ভাগে অসিরীয়া। মধ্য এশিয়ার এই দুটি নদীর মধ্যবর্তী অনেকখানি জায়গা জুড়ে সুমেরীয় নামে এক মানবজাতি প্রথম নগর পত্তন ক'রে, আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। এই অঞ্চলের বর্তমান নাম ইরাক। ইরাকের রাজধানী বোগদাদের কাছে প্রাচীন ব্যাবিলন শহরের ধ্বংসাবশেষ

আবিষ্কৃত হয়েছে। মোশুল শহরের কাছে অতীতের প্রসিদ্ধ শহর নিনেভের চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়।



মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা একটি অতি প্রাচীন সভ্যতা :—এটি মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। আবার অনেকে মনে করেন

মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা মিশরের চেয়েও প্রাচীন। মিশরে যখন একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সময়েই গড়ে উঠে ব্যাবিলনীয় ও অসিরীয় সাম্রাজ্য। প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে মেসোপটেমিয়ার জনপদগুলিই সবচেয়ে প্রাচীন। এখানেই কিন্তু প্রথম নগরী ও মন্দির নির্মিত হয়েছিল। উন্নত ধরণের কৃষির ব্যবস্থাও সবার আগে হয়েছিল এই মেসোপটেমিয়াতেই। মাটির নীচ থেকে পাওয়া বহু নিদর্শন এই সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়।

জীবন ও জীবিকা (ভূমির উর্বরতা, উৎপন্ন শস্যাদি ও বন্যা প্রতিরোধ)ঃ—মিশরের মত মেসোপটেমিয়ার সভ্যতাও নগরকেন্দ্রিক। তারা ছোট বড় অনেকগুলি নগর বসিয়েছিল। প্রত্যেক নগরে এক একটি অভিভাবক দেবতা ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন নগরীর প্রত্যেকটিই ছিল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এই নগরগুলির একটির সংগে আর একটির সদ্ভাব ছিল না। প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। সময় সময় একটি নগরী আর একটি নগরীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করত। ভূমির উর্ব্বরতা ও জল সেচের সুবিধা এই অঞ্চলে কৃষির অগ্রগতিতে সাহায্য করে। তখন এখানে অনেক জলাভূমি ছিল ও বড় বড় বিল ছিল। কৃষিই ছিল অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষির প্রয়োজনেই তারা দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে খাল কেটে জল নিকাশ করে জমি তৈরী করেছিল এবং খাল কেটে জল সেচের ব্যবস্থা করেছিল। নদীর পলিমাটি গঠিত জমি উর্ব্বর ছিল ফলে সেই জমিতে গম, যব, বার্লি, ধান, সরিষা প্রভৃতি বিভিন্ন শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। দোয়াবের উর্ব্বর জমিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য জন্মাত। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে তারা শস্যের ব্যবসাও করত। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা বড় বড় বাঁধ দিয়ে দেশকে ঘিরে ছিল। সেই সুদূর অতীতেও দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কৃষি ছাড়াও এখানকার অধিবাসীরা নানান শিল্প কর্মে দক্ষ ছিল। তারা তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ইত্যাদি ধাতুর

নানা জিনিষ তৈরী করত। জীবনযাত্রা আজকের দিনের চেয়ে কোন অংশে হীন ছিল না। অতি প্রাচীন যুগে মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা যে এক শান্ত, সুসভ্য জীবনযাপন ক'রত সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই।

সুমেরীয় সভ্যতা

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশে ছিল সুমেরীয়দের বাসভূমি। সুমের পারস্য উপসাগরের খুব কাছে এই অঞ্চল চারদিকে জলে প্লাবিত হয়ে থাকত। জলা ভূমিকে খাল কেটে জল বের করে বাঁধ দিয়ে শেওলা পরিষ্কার করে জল সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে সুমেরীয়রা দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলে। ক্রমে সুমেরীয় সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। কৃষি ছাড়াও নানান শিল্পকর্মে সুমেরীয়রা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। তারা মাটি দিয়ে অতি সুন্দর পাত্রাদি নির্মাণ করত। তামা, পিতল, ইত্যাদির বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সোনা, রূপা ও নানান মূল্যবান পাথরের অলংকার ও সৌখিন দ্রব্য সামগ্রী নির্মাণ করত। তাঁতীরা পশমের কাপড় বুনতে জানত। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। নাচ, গান, আনন্দ উৎসবের মধ্যে তাদের দিন কাটত। নৌকায় চড়ে বেড়ান তাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ঘোড়া, গাধা ও উটকে কাজে লাগানো মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা শিখেছিল। তারা কাঁচ নানা রঙে রাঙিয়ে ব্যবহার করত।



মেসোপটেমিয়ার মৃৎপাত্র

সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধাস্ত্র তৈরীতেও তারা অন্য দেশের থেকে অনেক উন্নত ছিল। সুমেরীয় সৈন্যদল বর্শা, ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করত এবং চামড়া অথবা

তামার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত। একালের সৈন্যদের মত তারাও রীতিমত কুজকাওয়াজ করত বলে মনে হয়। যুদ্ধ বিদ্যায় সুমেরীয়রা মিশরীয়দের থেকে উন্নত ছিল। মেসোপটেমিয়া সুমেরের পরে গড়ে উঠে অসিরীয় সভ্যতা। অসিরীয় সৈন্যরা সেকালে সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল। ধর্ম জীবনে কুসংস্কার ছিল অনেক, তবু ধর্ম জীবনটা উন্নতই ছিল। মাটি দিয়ে ছোট ঘর, দোকান, গরু ও চাকরের মূর্ত্তি তৈরী করে মৃতের সঙ্গে কবর দেওয়া হোত। সুমেরীয়রা মাটির ইট তৈরী করে পুড়িয়ে প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণ করত। সুমেরীয় স্থাপত্যে থাম ও বিশাল গম্বুজের প্রধান্য দেখা যায়। সুমেরীয়দের রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যাবিলন খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই ব্যাবিলন নগর কালক্রমে মেসোপটেমিয়ার রাজধানীতে পরিণত হয়।

প্রাচীন সুমেরীয়রা ভারী জিনিষ ব্যবহারের জন্য গাধায় টানা চাকা ওয়ালা গাড়ীর ব্যবহার করত। ইতিহাসে সুমেরীয়রাই প্রথম চাকা যুক্ত গাড়ীর ব্যবহার করে বলে জানা যায়। উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্যের বিনিময়ে তারা বিদেশ থেকে তামা কিনত এবং সুমেরীয় কামারেরা তামার বাসনপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরী করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করত। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রার পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে এরা লোহার ব্যবহার শিখেছিল এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদের তৈরী পশমের কাপড়ের খুব খ্যাতি ছিল। ব্যাবিলনের পর অসিরীয়া রাজ্যের উদ্ভব হয়। এদের রাজধানী প্রথমে ছিল অস্থুর নগরে পরে নিনেভে স্থানান্তরিত হয়। নিনেভের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই রাজা অস্থুরবাণী পালের বিরাট গ্রন্থালয় আবিষ্কৃত হয়েছে। কীলক লিপিতে লেখা ৩০,০০০ মাটির টালির তৈরী গ্রন্থ এখানে পাওয়া গেছে। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে এর কিছু নিদর্শন আছে। অসিরীয়রা যুদ্ধ বিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষ ছিল। অস্থুর নগরে একটি অস্ত্রশালাতেই সাড়ে পাঁচ হাজার মণ লোহার অস্ত্র পাওয়া গেছে। প্রাচীর ভেঙ্গে নগর দখল করার জন্য অসিরীয়রা একরকম মুদ্গর যন্ত্র ব্যবহার করত।

সুমেরীয় লিপি :—মিশরীয়দের মত সুমেরীয়রাও লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। তাদের লিপি **কীলকলিপি** নামে পরিচিত। এক সময় সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় এই লিপি প্রচলিত ছিল। নরম কাদার টালি তৈরী করে এরা খাগের কলমের চাপ দিয়ে কীলকের মত চিহ্নের সমবায়ে শব্দ রচনা করত। মাটির টালি গুলিকে পরে রোদে শুকিয়ে পুড়িয়ে নেওয়া হত। এদের লেখাগুলো খোঁচা খোঁচা তীরের ফলার মত দেখতে। তাই সুমেরীয় লিপিকে **"কিউনিফর্ম"** বা **কীলকলিপি** বলা হয়। কীলকলিপি চিত্রলিপিরই আর এক রূপ ; কিন্তু মিশরীয়দের মত সুমেরীয়রা শব্দচিত্র থেকে অক্ষরের সৃষ্টি করতে পারেনি। কীলকলিপিতে ক লেখা যায় না, ব লেখা যায় না, কিন্তু কর বা বন লেখা যায়। সুমেরীয়রা এরূপ শব্দ বাচক ৩৫০টি চিহ্ন ব্যবহার করত। নরম মাটিতে সহজেই লেখা যায়। আবার রোদে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে নিলে শক্ত ও স্থায়ী হয়ে যায়, সহজে নষ্ট হয় না। সুমের, ব্যাবিলন ও অসিরীয়ার লোকেরা কীলকলিপিতে চিঠিপত্র লিখত। হিসাব রাখত এমন কি জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি কঠিন বিষয়ে বই ও লিখত। আজ সভ্যতার অগ্রগতির চরম শিখরে দাঁড়িয়ে ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে, যে আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে মানুষ কত উন্নত সভ্যতা গড়ে ছিল।



কীলকলিপি

(২)

মিশর

অবস্থান ও ভুমি প্রকৃতি :—আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্ব অংশে মিশর দেশ। এই দেশের পূর্বে লোহিত সাগর উত্তরে ভূমধ্য সাগর ও পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি। মিশরের আবহাওয়া গরম ও রুক্ষ। তাই চাষ আবাদের সুবিধা নেই। আকাশে এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। এই

দেশের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নীল নদ। এই নীল নদে প্রতি বছর বন্যা নামে এবং নদীর দুই তীর ভেসে যায়। জমিতে পলি পড়ে মাটি



হয় সরস উর্ব্বর। নদীর জলে চাষ আবাদের বড় সুবিধা। নীলনদের কৃপায় মিশরের জমিতে সোনা ফলে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সহজ জীবনযাত্রার সুবিধার ফলে মিশরে মানবজাতির একটি শাখা বাসা বেঁধে ছিল। এই নীলনদই মিশরকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল এবং সভ্যতা বিকাশে মিশরকে সাহায্য করেছিল। এই জন্যই আদিম মিশরীয়রা নীলনদকে তাদের প্রধান দেবতাগণের মধ্যে একটি বলে পূজা করত। আর এই নদের নাম দিয়েছিল ওসাইরিস দেবতা। এই নদীতে প্রতি বৎসর বন্যা আসত, এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে মিশরীয়রা তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ও বারমাসে এক বৎসর এই তথ্য বুঝতে পারে এবং বর্ষপঞ্জীর জন্ম হয়।

মিশরীয়রা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে ও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব বিশেষ দেবতাও ছিল। পৃথক পৃথক অস্তিত্বের জন্য নীল নদের প্লাবনে প্রত্যেকটি অঞ্চলেরই বিশেষ ক্ষতি হতে লাগল। সকলে এক হয়ে না দাঁড়ালে এই প্লাবনের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করা সম্ভব ছিল না। তাই মিশরীয়রা একতাবদ্ধ হল এবং জনপদগুলি মিলিত হয়ে পরিণত হল রাজ্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একটি বিরাট রাজ্যে পরিণত হল। কালক্রমে তাই মিশরীয়রা একটি শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত হল।

ফ্যারাও ও পুরোহিত সম্প্রদায়ঃ—মিশরীয়রা তাদের রাজাকে বলত ফ্যারাও। ফ্যারাও কথার অর্থ যিনি বড় বাড়ীতে থাকেন। রাজার প্রাসাদ সাধারণ লোকের বাড়ীর থেকে অনেক বড়। প্রায় তিন হাজার বছর বিভিন্ন রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করে। উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক রাজার শাসনে আসবার দু'হাজার দু'বছর পরে এশিয়া মহাদেশের আরব থেকে হিক্‌সস নামে এক যাযাবর জাতি মিশর জয় করে শাসন করতে থাকে। প্রায় পাঁচশ' বছর মিশর হিকস্‌সদের শাসনে ছিল। তারপর দক্ষিণ মিশরের এক স্বাধীন রাজবংশ বিদেশীদের তাড়িয়ে দেন। হিকস্‌সদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মিশরীয়রা যুদ্ধ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠে। কালক্রমে ফ্যারাওরা পররাজ্য জয় করবার নীতি অনুসরণ করে এবং আফ্রিকার বাহিরে পশ্চিম এশিয়ায় আপনাদের রাজ্য বিস্তার করতে উদ্যোগী হয়। দিগ্বিজয়ী ফ্যারাওদের মধ্যে তৃতীয় থাটমোসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁকে রাজা না বলে সম্রাট বলা চলে। তাঁর সাম্রাজ্য আবিসিনিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কারণাকে মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে তৃতীয় থাটমোসের দিগ্বিজয়ের বিবরণ আছে।

প্রাচীন মিশরীয় সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশী ছিল। মিশরে পুরোহিতরাই ছিলেন লেখাপড়া জানা পণ্ডিত; মন্দির সংলগ্ন বিদ্যালয়ে তাঁরাই শিক্ষকতা করতেন। মন্দিরের সম্পত্তি

তত্ত্বাবধানের ভারও ছিল তাঁদেরই উপর। এক সময়ে মিশরের সমস্ত চাষের জমির সাত ভাগের একভাগ দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে পুরোহিতদের অধিকারে ছিল। এক লক্ষ সাত হাজার গোলাম তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। তাঁদের গোয়ালে ছিল পাঁচ লক্ষ গরু, আর রাজসরকারকে একটি পয়সাও কর না দিয়ে ১৬৯টি শহরের রাজস্ব ভোগ করত। সুতরাং ধনবল ও বিদ্যাবলে পুরোহিতরাই ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা।

মিশরীয় লিপি—মিশরীয়দের জীবনযাত্রার বহু প্রাচীন বিবরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। নলখাগড়া জাতীয় একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ থেকে তৈরী প্যাপাইরাস নামক একপ্রকার কাগজে, গঁদের মত একপ্রকার আঠা ও ঝুল জলে গুলে তৈরী কালিতে ছবির হরফে মিশরীয়রা প্রথম লেখা শুরু করে। আস্তে আস্তে তারা একটি অভিনব বর্ণমালার সৃষ্টি করল। মিশরের সর্বপ্রধান অবদান এই চিত্রলিপি (Hieroglyphics)। প্রথমে ছবির সাহায্যে বক্তব্য রেখে ছোট ছোট খবর আদান-প্রদান করা হত। চিত্রলিপির সুবিধা এই যে ভাষা না থাকলেও চিত্রের সংকেতে বক্তব্য বুঝা যায়। মিশরীয়রা শব্দবাচক চিত্রের ব্যবহার করত। ক্রমে মিশরীয়রা এক একটি ছবি দিয়েই একটি ধ্বনি নির্দেশের নিয়ম বার করে, যেমন ধরা যাক কুড়ুলের প্রথম ধ্বনি "ক" অতএব কুড়ুলের ছবিই "ক" ধ্বনির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যদিও মিশরীয়রা ঠিক এই ছবিগুলি ব্যবহার করেনি কিন্তু তাদের বর্ণমালা এই নিয়মে রচিত হয়েছিল। মিশরীয় চিত্রলিপিতে স্বরবর্ণের কোন চিহ্ন নেই। মিশরের এই চিত্রলিপি থেকে একালের সভ্য দেশে প্রচলিত অক্ষর ও লিপির জন্ম হয়েছে।



মিশরীয় লিপি

গ্রীক রাজত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশর দেশের প্রাচীন ভাষাও লুপ্ত হয়ে গেল। মিশরের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে নানা জিনিস পাওয়া গেল

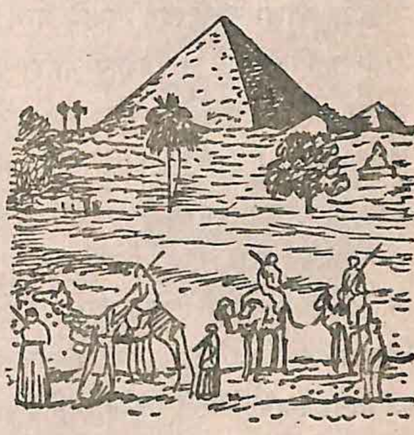
কিন্তু ভাষা পড়া গেল না। মন্দিরে প্রাসাদে আঁকা রয়েছে নানান ছবির মত, কিন্তু এগুলি কেউ বুঝত না। প্রাচীন মিশরীয় সাম্রাজ্যের অবসানের পর প্রায় চার'শ বছরের মধ্যে কেউই এই বিচিত্র লিপি পড়তে পারেনি। ১৭৯৮ খৃঃ মহাবীর নেপোলিয়ন যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন তাঁর একজন কর্মচারী নীল নদের অববাহিকায় রসেটায় এক অদ্ভুত ধরণের লেখাযুক্ত একখণ্ড পাথর দেখতে পান। এই পাথরটিতে তিনটি বিভিন্ন ধরণের লিপি ছিল। দুটি অচেনা চিত্র দ্বারা অচেনা ভাষায় এবং অপরটি গ্রীক অক্ষরে গ্রীক ভাষায়। ফরাসী পণ্ডিত শাঁপলিয়ে বিশ বৎসর পরিশ্রম করে মোট চোদ্দটি অক্ষর পাঠোদ্ধার করেন। এইভাবে প্রাচীন মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। প্রাচীন মিশরীয় ভাষা পাঠ করা সম্ভব হতেই মিশরের প্রাচীন ইতিহাস জানাও সহজ হয়ে গেল।

মিশরের সৈনিক ও নানা শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। মন্দির, প্রাসাদ ও পিরামিডের গায়ে অঙ্কিত চিত্রলিপি থেকে জানা যায়, এক শ্রেণীর কর্মচারী রাজস্ব আদায় করত। প্রথমে মিশরীয়রা যুদ্ধ বিগ্রহ পছন্দ করত না। তাই মিশরের পদাতিক সৈন্য হিকস্‌সের রথীদের কাছে যুদ্ধে হেরে যায়। বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রমে তারা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠে। এরা হিকস্‌স নামক বিদেশীদের অধিকার থেকে মিশরকে আবার স্বাধীন করে। মিশরীয় সৈন্যদল ক্রমে এত শক্তিশালী হয় যে তৃতীয় থাটমোসের নেতৃত্বে তারা পশ্চিম এশিয়ায় কিছু অংশ দখল করে এবং মিশরীয় নৌবাহিনী ভূমধ্য-সাগরের কতকগুলি দ্বীপ অধিকার করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ—সে যুগে মিশরীয়রা পাথরের কাজে, ছুতারের কাজে, হাতীর দাঁতের কাজে, বস্ত্র শিল্পে, রঙীন কাঁচ ও চামড়ার কাজে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। খাদ্য-শস্য ও নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য মিশরীয়রা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বেচা কেনা করত। মিশরীয়দের কোন মুদ্রা ছিল কিনা জানা যায় না তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিরামিড ও ধর্মীয় বিশ্বাস :—প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যে এক অদ্ভুত ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, তারা বিশ্বাস করত যে মৃতদেহ যতদিন রক্ষা করা যাবে ততদিন সেই মানুষের আত্মা স্বর্গে বাস করবে। এই বিশ্বাসের ফলেই মৃতদেহকে মামি করবার প্রথা প্রচলিত হয়।

নানারকম জিনিষ মিশিয়ে একরকম আরক তৈরী করে সেই আরক মৃতদেহে মাখিয়ে পাতলা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে মৃতদেহটি কাঠের বাক্সে ভরে রাখা হত। এই পদ্ধতিকে মামি করা বলে। মামি করা এই রকম মৃতদেহ হাজার হাজার বছর অবিকৃত থাকত। মিশরের রাজাদের মধ্যে অনেকে তাঁদের মৃতদেহগুলি রক্ষা করবার জন্য নিজেরাই বড় বড় সমাধি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এই গুলিই হল মিশরের পিরামিড। চার কোনা ভিতের উপর বড় বড় পাথর থাকে থাকে গেঁথে এগুলি তৈরী করা হত। উপরের অংশ ক্রমে সরু করে গাঁথা হত। যে কোন পাশ দিয়ে দেখলে এগুলিকে ত্রিভুজের মত দেখায়, তখনকার দিনে বর্তমান যুগের মত যন্ত্রপাতি ছিল না। কেবলমাত্র দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা বিশাল পিরামিডগুলি তৈরী হত। হাজার হাজার শ্রমিকের কয়েক বছরের পরিশ্রমে এগুলি তৈরী হত। এই অতিকায় সমাধির মধ্যে প্রবেশের জন্য নীচের দিকে একটি ছোট গুপ্ত দ্বার থাকত। কেবলমাত্র রাজাদের ও তাদের পরিবারের জন্যই পিরামিড নির্মিত হত না। ধনীরা অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ও ছোট ছোট পিরামিড তৈরী করাতেন। এই সকল পিরামিডের দেওয়ালে মৃত ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের বহু ছবি আঁকা থাকত। এই পিরামিডগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশাল ও



মিশরের পিরামিড

বিস্ময়কর ছিল **চিওপস** নামে একজন ফ্যারাওয়ের পিরামিড। এই পিরামিডটি প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু ও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের একটি। এটি তৈরী করতে প্রায় ত্রিশ বছর সময় লেগেছিল। গিজের সুবৃহৎ পিরামিড তৈরী হয়েছিল রাজা থুপুর মামির জন্য। প্রায় বিশ বৎসর আগে সম্রাট তৃতীয় থাটমোসের বংশধর টুটান্‌খামেনের সমাধি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজার নিত্য ব্যবহার্য্য বহু মূল্যবান জিনিষ এই সমাধিতে পাওয়া গেছে। পিরামিডগুলি প্রাচীন মিশরীয়দের ভাস্কর্য্য ও শিল্প কীর্ত্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। খাফ্রে নামে এক ফ্যারাও একটি পাহাড় কেটে এক বিরাট সিংহ মূর্ত্তি তৈরী করান। এটির দেহ সিংহের মত কিন্তু মাথা ও মুখ মানুষের মত। এই বিস্মকর মূর্ত্তিটির নাম স্ফিংক্স।

মিশরীয়রা বিশ্বাস করত আত্মার মৃত্যু নেই এবং মৃত্যুর পরও মানুষের আত্মা মৃতদেহের মধ্যেই বাস করে। তাই মৃতদেহকে নষ্ট হতে না দিয়ে মিশরীয়রা মৃতদেহকে মামি করে রাখত। প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে জীবিত লোকদের মত মৃত ব্যক্তিদেরও ভোগ করার ক্ষমতা থাকে। তাই সমাধি স্থলে মামির কাছে মৃতের ব্যবহার্য্য সমস্ত সামগ্রী, বহুমূল্য অলংকার, পালঙ্ক, বিছানা, বাদ্যযন্ত্র, সুগন্ধি দ্রব্য, খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে ধোপা, নাপিত, চাকর প্রভৃতির মূর্ত্তি রাখা হত। টুটান্‌খামেন নামক এক রাজার কবর থেকে অপূর্ব কারুকার্য্য খচিত পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, নানা রকমের পাত্র, রাজপোষাক, সোনার গহনা ও নানা ধরণের বহু মূল্যবান জিনিষপত্র পাওয়া গেছে।

মিশরের দেবদেবী :—মিশরে বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশের মত অনেক পশু-পক্ষীকেও এরা দেবতা রূপে পূজা করত। মিশরের গাভী দেবতা, বানর ও বিড়াল ইত্যাদি জীবজন্তুর মূর্ত্তি দেবতারূপে পূজিত হত। মিশরের দেবতাদের মধ্যে **রা, এমন ও ওসাইরিস** প্রধান। রা সূর্য্যের দেবতা পরে এমন্ তার স্থান অধিকার করে। **ওসাইরিস** ছিলেন নীলনদ ও পরলোকের দেবতা। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত দেবতারা নানান জীবজন্তুর মূর্ত্তি

ধরে মানুষকে দেখা দেন। এমন্ দেবতার উদ্দেশ্যে মিশরীয়রা অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর ছিল "কারণাকের" মন্দির। সেকালে এরূপ বৃহৎ মন্দির আর ছিল না। এর একটি কক্ষই ছিল ৩৩৮ফুট চওড়া। এই কক্ষে একশত ছত্রিশটি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলির গড়ন ও কারুকার্য্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।


ওসাইরিস

রাজা তৃতীয় থাটমোসের মত ভক্তরা পশ্চিম এশিয়া জয় করে যে বিপুল ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন তাতেই এই অপূর্ব মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। এমন্ দেবতার মত এত ঐশ্বর্য্য না থাকলেও ওসাইরিসের ভক্ত সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। কারণ মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর মৃতের পাপ-পুণ্যের বিচার হয় ওসাইরিসের দরবারে। ওসাইরিস নীলনদের দেবতা। প্রতি বৎসর নীলনদের জল যখন শুকিয়ে যেত তখন হত তাঁর মৃত্যু। আবার নদীর প্লাবনে তাঁর জন্ম। নীলনদের কৃপায় প্রাচীন মিশর ছিল শস্য-শ্যামল।

মিশরীয়দের প্রধান প্রধান উপজীবিকা :—মিশরের সমাধি মন্দিরের প্রাচীরের চিত্র থেকে মিশরীয়দের সমাজ জীবনের বহু বিবরণ জানা গেছে। মিশরীয়রা প্রধানতঃ ছিল কৃষিজীবি। গরু ও ঘোড়ার দ্বারা কাঠের লাঙল দিয়ে তারা জমি চাষ করত। পশুপালনও তাদের অন্যতম উপজীবিকা ছিল। সমাধি মন্দিরের গায়ে আঁকা গো দোহনের চিত্র থেকে এটি স্পষ্টই বুঝা যায়। অন্যান্য উপজীবিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোনা রূপার অলংকার নির্মাণ, মাটির ইট

তৈরী, ছুতোরের কারখানা, কামার ও কুমোরের কাজ। প্রাচীন মিশরীয়রা হাতে সুতা কেটে খুব সূক্ষ্ম কাপড় তৈরী করতে পারত। কাঁচের জিনিষপত্র তৈরীর কৌশল তারাই প্রথম আবিষ্কার করে।

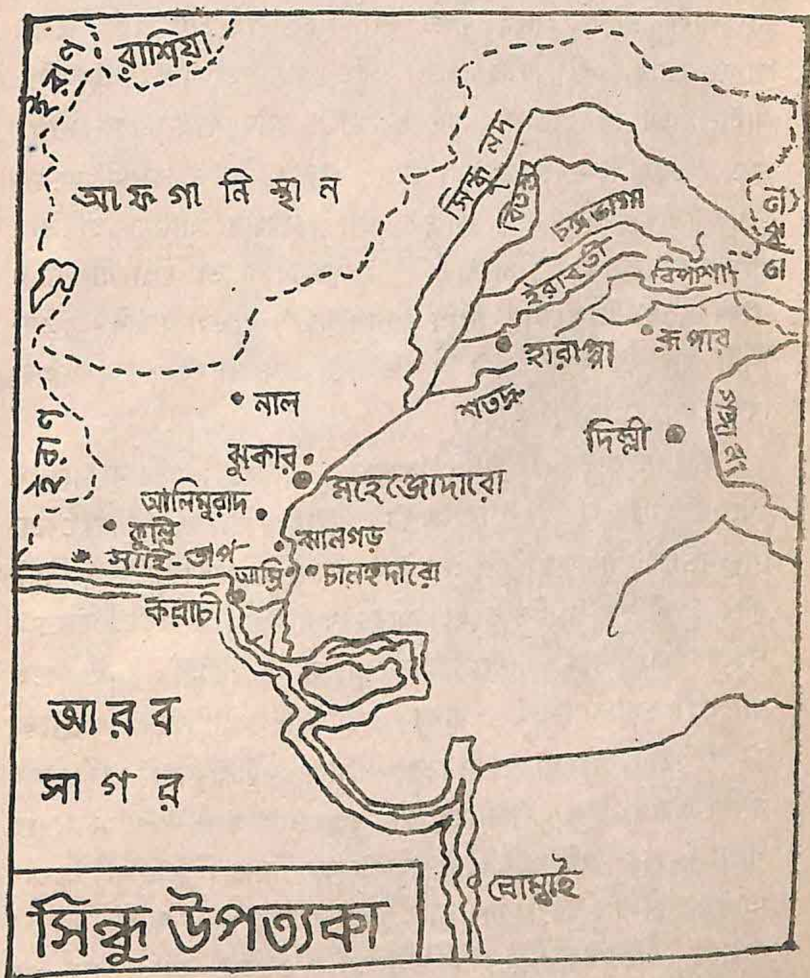
(৩)

সিন্ধু-সভ্যতা

মিশর, মেসোপটেমিয়া ও চীনের মত আমাদের দেশও এক মহান সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। এখানেও গড়ে উঠেছিল নদীমাতৃক সভ্যতা। ভারতের সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত সভ্যতা পৃথিবীর অতি প্রাচীন সভ্যতাগুলিরই সমসাময়িক। সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের আগে পর্য্যন্ত ধারণা ছিল আমাদের দেশের সভ্যতা অধিক দিনের পুরানো নয়। কিন্তু মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় মাটি খুঁড়ে যেদিন বের হল এক উন্নত ও বিচিত্র সভ্যতার নিদর্শন ; সেই মুহূর্ত্তেই প্রমাণিত হল সুদূর অতীতে যখন ইউরোপ ও আমেরিকার মানব কূল সভ্যতার শৈশবে রয়েছে সেই সময় ভারতবাসীরা গড়ে তুলেছে এক অতি উন্নত সভ্যতা।

অবস্থান ঃ—ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন এই দুটি সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে, সিন্ধু প্রদেশের লারকোনা জেলার মহেঞ্জোদাড়োতে এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত মন্টগোমারি জেলার হরপ্পায়। সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা অনেক উত্তরে অবস্থিত। এই দুটিই এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। ১৯২২ খ্রীঃ বাঙালী ভূতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের ধ্বংসস্তূপ দেখে অনুমান করেন যে এখানে বৌদ্ধ যুগের আগের কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতে পারে। খনন কার্য্যের পর মাটির নীচ থেকে বের হয় একটা অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। "**মহেঞ্জোদাড়ো**" কথার অর্থ মৃতের স্তূপ। এই ধ্বংসস্তূপ গুলিকে স্থানীয় লোকেরা মৃতের স্তূপ আখ্যা দিয়েছিল। সেই থেকেই এই জায়গার নাম হয়েছে মহেঞ্জোদাড়ো। এর কয়েক বছর পরে দয়ারাম সাহানী পাঞ্জাবে রেললাইন তৈরীর

সময় হরপ্পার সভ্যতাকে আবিষ্কার করেন। অবশ্য এর অনেক দিন আগেই ঐতিহাসিক ক্যানিংহাম হরপ্পায় অতি প্রাচীন সভ্যতার কতকগুলি নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেদিকে তখন পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। সিন্ধুনদের অববাহিকায় এগুলি



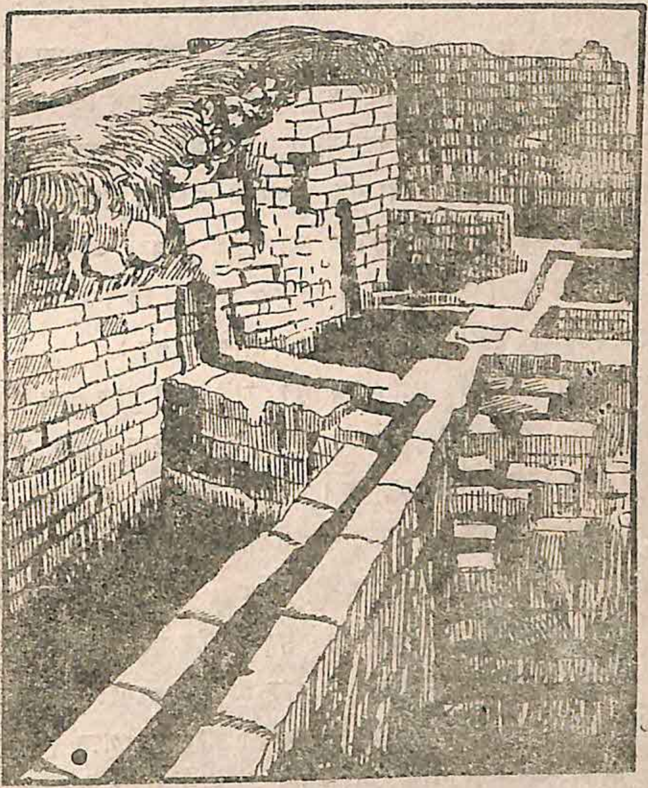
আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এই সভ্যতাকে **সিন্ধু-সভ্যতা** বলে। এই সভ্যতা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। এই দুটি সভ্যতা লৌহ যুগেরও আগের। এরপর মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা ছাড়াও বেলুচিস্তান থেকে রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশ; পঞ্চনদ থেকে গুজরাট

পর্য্যন্ত বিরাট অঞ্চলে এ যুগের তৈরী আরো অনেকগুলি শহর ও জনপদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে।

সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা কারা—এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন আর্য্য জাতির ভারতে আসার বহু আগে দ্রাবিড় নামে একটি জাতি এই সভ্যতার সৃষ্টি করে। আবার আর এক শ্রেণীর মতে এটিও আর্য্যসভ্যতা। ঋক্‌বেদীয় আর্য্যদের ভারতে প্রবেশের অনেক আগে আর্য্যদেরই একটি শাখা সমুদ্র পথে সিন্ধুনদের মোহনা দিয়ে ভারতে বসতি স্থাপন করে। এদের সভ্যতা ছিল নগর কেন্দ্রিক এবং ঋক্‌বেদীয় আর্য্যসভ্যতা ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক। এই ধারণাগুলি কতদূর সত্য তা বলা যায় না। কারণ সিন্ধুসভ্যতার কোন লিপি এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই লিপি যদি কোনদিন কেউ পড়তে পারে তবে আরও কত চমকপ্রদ বিবরণ আমরা জানতে পারব।

সিন্ধুসভ্যতার বিবরণ (নগর স্থাপত্য):—লিখিত বিবরণ না পাওয়া গেলেও মাটি খুঁড়ে যে সব নিদর্শন বেরিয়েছে তা থেকে জানা গেছে সিন্ধু-সভ্যতা নগর স্থাপত্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। মহেঞ্জোদাড়োর মাটি খুঁড়ে একটি সুপরিকল্পিত সুবৃহৎ নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। শহরের রাজপথগুলি পাথরে বাঁধান প্রশস্ত ও সোজা। এগুলিতে যানবাহন চলাচল করত। রাস্তার দুপাশে ছিল সারিবদ্ধভাবে পোড়া ইটের তৈরী দোতলা ও তিনতলা বাড়ী ও অট্টালিকা। বাড়ীগুলির নীচের তলায় ছিল দোকানের সারি। বড় রাস্তাগুলি থেকে আবার গলি ও ছোট রাস্তা বেরিয়ে শহরের নানাদিকে গিয়েছিল। ঘরের প্রবেশ পথগুলি ছিল সাধারণতঃ বড় রাস্তার সংলগ্ন গলির ভিতরে। এখানে তিন রকম গৃহের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যেমন বাস গৃহ সরকারী গৃহ ও স্নানাগার। এ ছাড়াও ছিল শস্যাগার ও শ্রমিকদের বসবাসের জন্য নির্মিত সারিবদ্ধ গৃহশ্রেণী। শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও জল নিকাশের সুব্যবস্থা ছিল। রাস্তার পাশে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও আধুনিক সুসভ্য নগরী কল্‌কাতার মত মাটির

নীচে তৈরী পাকা নর্দমা ছিল। বাড়ীর আবর্জনা ফেলার জন্য পথের পাশে আজকালের ডাষ্টবিনের মত গর্ত ছিল। এখানে একটি স্নানাগার



পয়ঃপ্রণালী

আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি এত বড় যে সেখানে একসঙ্গে একশ লোক স্নান করতে পারত। তাছাড়াও শস্য জমিয়ে রাখার জন্য ছিল বিশাল বিশাল শস্যাগার। এই শস্যাগারগুলিতে উদ্বৃত্ত শস্য অজন্মার সময়ের জন্য জমিয়ে রাখা হত। সেই অতি প্রাচীন যুগেও এগুলি এত উন্নত স্থাপত্য কৌশলে তৈয়ারী করা হয়েছিল যে শস্য নষ্ট হত না। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার নাগরিক জীবন ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ। শহরগুলির উন্নত পূর্তকার্য্য; দালান, প্রাসাদ, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতা এক উন্নত ধরণের নাগরিক সভ্যতা রূপে গড়ে উঠেছিল।

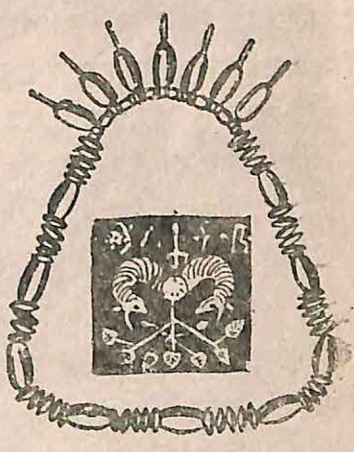
খাদ্য ও ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী :—সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীদের উপজীবিকা ছিল কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এখানকার উর্বর জমিতে যব, গম, বার্লি ও কার্পাসের চাষ হত। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা গম, যব, বার্লি, খেঁজুর প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্য খেত। আবার আমিষ খাদ্যের মধ্যে ভেড়া ও শূকরের মাংস ছিল প্রধান। সিন্ধু-উপত্যকার প্রাচীন ঢিবির নীচে থেকে মটর, সরিষা, তরমুজ ও খেঁজুরের বীজ পাথর হয়ে যাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রচুর তুলা উৎপন্ন হওয়ায় সে যুগে স্থতীর কাপড়ের অধিক প্রচলন ছিল। অবশ্য পশমের তৈরী কাপড়ের ব্যবহারও অজানা ছিল না। তুলার আঁশ থেকে কাপড় তৈরী এখানেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

মহেঞ্জোদাড়োরমাটির তলা থেকে খুব ছোট ছোট পাত্র এবং বিশাল বিশাল মাটির পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কলকাতার সংগ্রহ শালায় এগুলির কিছু নিদর্শন রাখা হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলংকার পরত। মাটির তলায় পাওয়া সোনা, রূপা, কাঁসা ও পাথরের তৈরী বহু অলংকারের নিদর্শন থেকে এ কথা বুঝা যায়। মাটির তলা থেকে বের হয়েছে ধাতু ও পোড়া মাটির বহু শীলমোহর এতে আঁকা আছে নানা জীবজন্তুর ছবি। তাছাড়া বের হয়েছে নানা মূর্ত্তি। সিন্ধু-উপত্যকায় যে সব মূর্ত্তি ও শীলমোহর পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় পুরুষেরা দাড়ি রাখত। কিন্তু ঠোঁটের উপরের চুল কামিয়ে ফেলত এবং মাথার চুল পিছন দিকে খোঁপার মত বেঁধে রাখত। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর হাড় পাওয়া গেছে। সেই সমস্ত পরীক্ষা করে মনে হয়েছে যে এরা নানাপ্রকার জীবজন্তু পালন করত।

সে যুগের সুসভ্য অধিবাসীরা শিশুদের খেলনার জন্য চেয়ার, চাকাওয়ালা গাড়ী, মাটির পাখী, ফাঁপা ঝুম-ঝুমি তৈরী করত। যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী তীর ধনুক, বর্শা, ছুরি, গদা, কুঠার, তরবারি, শিরস্ত্রাণ, ঢাল প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল। তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে কুকুর, বিড়াল, গরু, উট ও গাধা উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন শীলমোহর ও চিত্র থেকে এগুলি জানা গেছে। তবে ঘোড়ার কোন চিত্র বা শীলমোহর পাওয়া যায়নি। সুতরাং মনে হয় এরা ঘোড়াকে পোষ মানাতে শেখেনি।

শিল্প-সামগ্রী :—মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার শিল্পীরা নানারকম বাসনপত্র, অলঙ্কার ও আসবাবপত্র তৈরী করত। আগুনে পুড়িয়ে ইট তৈরীতে এরা খুব দক্ষতা অর্জন করেছিল। মাটির পাত্র তৈরী করে এরা সেগুলিকে চক্‌চকে পালিশ করত এবং তুলি দিয়ে নানারকমের চিত্র-বিচিত্র আঁকত। এসব পাত্র তৈরী করার জন্য এরা এখনকার মত কুমোরের চাকা ব্যবহার করত। শিল্পীরা সোনা, রূপা, তামা ও দামী দামী পাথরের দ্বারা নানারকম অলঙ্কার তৈরী করত। হাতীর দাঁতের এবং ঝিনুকের তৈরী অলঙ্কার সেই আমলে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। লোহা ছাড়া অন্য সব ধাতু দ্বারা নানান প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র তৈরী করত এবং তাহার উপর সুন্দর কারুকার্য্য করত। সে যুগের দক্ষ শিল্পীরা সূক্ষ্ম সূঁচ, বড়শি, ছুরি, কুড়াল, কাস্তে, ক্ষুর, সুতা কাটার টাকু এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি ছোট বড় নানান সামগ্রী তৈরী করত। সিন্ধু-উপত্যকার শিল্পীরা পোড়া মাটির ও পাথরের অপূর্ব মূর্ত্তি তৈরী করতে পারত।


অলংকার (গলার হার)

ব্যবসা বাণিজ্য :—সিন্ধু-সভ্যতার যুগের অধিবাসীরা দেশের ভিতরে ও বাহিরে ব্যবসা বাণিজ্য চালাত। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় নৌকার ছবি খোদাই করা কয়েকটি শীলমোহর পাওয়া গেছে। এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সে যুগের বণিকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জলপথে দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করত। ব্যবসার সূত্রেই

ভারতের বিভিন্ন অংশ এবং ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে ছিল। সেই আমলে আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, বেলুচিস্থান, পারস্য, মিশর মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশে সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা যাতায়াত করত। মিশর ও মেসোপটেমিয়ার ধ্বংস স্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত দীপাধার ও ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ইত্যাদি প্রমাণ করে যে এই দেশগুলির সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার সংযোগ ছিল।

ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা ব্যবহৃত হত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই খুব সম্ভব শীলমোহর ব্যবহৃত হত। সমাজের একটি সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করত। বিভিন্ন শিল্প-দ্রব্য ও উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য তারা দেশের অভ্যন্তরে এবং সে যুগের বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ অঞ্চলে বেচা-কেনা করত। মেসোপটেমিয়ার আক্কাদে যে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের একটি উপনিবেশ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী :—সিন্ধু-সভ্যতার যুগের কোন মন্দির বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং সেই যুগের মানুষের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন মূর্ত্তি খোদাই করা বহু শীলমোহর এবং স্ত্রী ও পুরুষের অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এইগুলি থেকে সে যুগের লোকদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা করা যায়। বর্তমান কালের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এদের ধর্মের অনেক মিল ছিল। তাদের মধ্যেও মূর্ত্তি পূজার প্রচলন ছিল। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহরে বহু নারী মূর্ত্তি খোদিত আছে তা ছাড়া বহু নারী মূর্ত্তিও বেরিয়েছে, এ থেকে অনুমান করা যায় তারা আমাদের পূজিতা দেবী দুর্গা, কালী ইত্যাদির মত কোন মাতৃকা দেবীর পূজা করত। এই মাতৃকা দেবী জগন্মাতা, শক্তি বা মহাদেবীও হতে পারেন। মহেঞ্জোদাড়োতে একটি সুন্দর **শীলমোহর** পাওয়া গেছে। এই শীলমোহরটি এক ধ্যানমগ্ন যোগী পুরুষের; এর মাথায় তিনটি শিং

এবং চারিদিকে জীবজন্তু পরিবেষ্টিত। এটি দেখে মনে হয় তারা মহাযোগী পশুপতি শিবের মত কোন দেবতার পূজা করতেন। সম্ভবতঃ শিবলিঙ্গ পূজারও প্রচলন ছিল; হরপ্পায় প্রাপ্ত লিঙ্গের মত পাথর থেকে এরূপ অনুমান করা যায়। সেই আমলে নানা প্রকার জীবজন্তুর, বৃক্ষ ও পাথরের পূজা প্রচলিত ছিল। ধর্মের উপরি উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও হিন্দু ধর্মেও দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দুরা সম্ভবতঃ এদের কাছ থেকেই দেবদেবীর পূজা করা শিখেছিলেন।



শীলমোহরে পশুপতির মূর্ত্তি

কোন দেবালয়ের চিহ্ন না পাওয়া যাওয়ায় এরূপ মনে করা হয় যে, দেব আরাধনাকে অধিবাসীরা ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্ম বলে মনে করত, তাই লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতেই পূজা ও উপাসনা করত। রাষ্ট্রের এ বিষয়ে কোন স্বীকৃতি বা বাধা নিষেধ ছিল না।

মৃতদেহ পোড়ান হত আবার অনেক সময় কবরও দেওয়া হত। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় যে বিরাট বিরাট মাটির জালার মত পাত্রগুলি পাওয়া গেছে এগুলির মধ্যে মৃতদেহ রেখে মাটির নীচে কবর দেওয়া হত।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বের বিবরণ:—সিন্ধু সভ্যতার যে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় সে যুগে মানুষের জীবনযাত্রা খুবই উন্নত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে এখানকার জনগণ চারটি বিভিন্ন জাতি থেকে উদ্ভূত। শিক্ষিত সম্প্রদায়, যোদ্ধা, শিল্পী বা বণিক ও শ্রমিক শ্রেণী। পুরোহিত চিকিৎসক, জ্যোতিষিগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে আমলে সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায়নি। তবে খনন কার্য্যের ফলে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও তরবারি বের হয়েছে, যা

থেকে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন নগর ও প্রাসাদ ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ছিল। ব্যবসায়ী এবং কারিগর সম্প্রদায় যেমন রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, তাঁতী প্রভৃতি ছিল তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ বণিক শ্রেণীর অন্তর্গত। গৃহভৃত্য, জেলে, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি ছিল শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। কৃষক সম্প্রদায় গ্রামাঞ্চলে থেকে কৃষিকার্য্য করত। তাছাড়া ছিল পশুপালন। শিল্পী বা বণিক সম্প্রদায় যথা তাঁতী, ছুতারমিস্ত্রী, কর্মকার, স্বর্ণকার, রাজমিস্ত্রী, হাতীর দাঁতের কারিগর ইত্যাদি নানাপ্রকার জিনিষ তৈরী করে বিক্রী করত। সমাজে বর্ণ বৈষম্য ছিল; অভিজাত শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রা ও অবস্থার তফাৎ ছিল। ধনীরা অধিকাংশ শহরে ও বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকায় বাস করত। খেটে খাওয়া মানুষেরা তার থেকে অনেক নিকৃষ্ট গৃহে শহরের একপাশে বাস করত। শহরের একাংশে আবিষ্কৃত আজকালের কুলি বস্তীর মত সারিবদ্ধ গৃহের ধ্বংসাবশেষ থেকে এ ধারণা করা যায়।

সিন্ধু সভ্যতা ভারতের গৌরবের বস্তু। এটি আবিষ্কার হওয়ার পর আমরাও একথা ভেবে গর্বিত হই যে আমরাও পৃথিবীর অতি প্রাচীন দু একটি সভ্য জাতির অন্যতম। এই সুমহান সভ্যতা কিভাবে যে ধ্বংস হল এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। অনেকে মনে করেন সিন্ধুনদের ভয়াবহ বন্যা এবং ঐ অঞ্চলের জলবায়ুর পরিবর্ত্তন সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসের কারণ। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আর্য্য বা অপর কোন বহিরাগত জাতির সঙ্গে যুদ্ধে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর পুসলকারের মতে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা নগর দুটির উপযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনী না থাকায় বৈদেশিক আক্রমণই ইহাদের ধ্বংসের কারণ।

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতাগুলির সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করলে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কতকগুলি দিক দিয়ে সিন্ধু-সভ্যতা মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। মিশরীয় ও সুমেরীয়রা বড় বড় প্রাসাদ, অট্টালিকা ও

সমাধি, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করলেও সাধরণ বাসগৃহ, স্নানাগার, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও সুপরিকল্পিত নগর স্থাপত্যে সিন্ধুবাসীরা অনেক উন্নত ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার নগর স্থাপত্যকে আধুনিক অতি উন্নত নগর স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাছাড়া সিন্ধু-উপত্যকায় মাটির নীচে থেকে এমন কতকগুলি মূর্ত্তি বেরিয়েছে সেগুলিকে প্রাচীন গ্রীসের অতি উন্নত ভাস্কর্য্য শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

(৪)
চীন

হোয়াংহো ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকায় গড়ে উঠা সভ্যতার বিবরণ :—মিশর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু-সভ্যতার মত চীনেও অতি প্রাচীন কালের একটি সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতারও আরম্ভ হয় নদী তীরে। এই সভ্যতা চীনের উত্তর পূর্ব অংশে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলে অতি প্রাচীন কালে একটি সুসভ্য জাতি বাস করত। এরা এখানকারই আদিম অধিবাসী এবং এরা বাইরের কোন দেশ থেকে এসেছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন না। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে থেকে চীনের ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু চীনেরা এরও অনেক আগে থেকে বেশ সভ্য হয়ে উঠে। হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকার সভ্যতা মিশর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার মত এত প্রাচীন নয় বলেই ঐতিহাসিকদের ধারণা, তবে সে যুগের ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদি থেকে অনুমান করা যায় এটিও পৃথিবীর একটি সুপ্রাচীন সভ্যতা।

চীনের প্রাচীন ইতিহাস :—চীনের আদিম মানুষরাও সমস্ত আদিম মানুষের মত রান্না বান্না করতে জানত না, মাছ ধরতে জানত না, কাপড় বুনতে জানত না। তাদের সামাজিক জীবন বলে কিছু ছিল না। অন্যান্য দেশের আদিম মানুষের মত চীনের লোকেরাও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। ধাতুর যুগের পূর্ব্বে চীনের আদিম

মানুষেরা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও ঝিনুকের অস্ত্রশস্ত্র ও গহনা ব্যবহার করত। এরা শূকর, কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তু পুষত। মাটি দিয়ে তৈরী পাতলা কাল রং এর একরকম পাত্র তৈরী করত।

চীনের সভ্যতা বিকাশ ও বন্যা সম্বন্ধে প্রচলিত উপকথা :— চীনের প্রাচীন ইতিহাস অনেক পরে লেখা হয়েছে। তাই তাতে অনেক আজগুবি গল্প ও উপকথা স্থান পেয়েছে। কথিত আছে চীনের আদি পুরুষ ছিলেন পানকু। তিনি আঠার হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। চীনের নদনদী, পাহাড়, পর্বত, হ্রদ, সাগর সমস্ত তাঁর হাতের তৈরী। তাঁর নিশ্বাস থেকে বাতাস আর মেঘ, হাড় থেকে বিভিন্ন ধাতু, মাংস থেকে মাটি, চুল থেকে গাছপালা ও শিরাগুলি থেকে নদনদী এবং গায়ের উকুন থেকে নাকি মানুষের সৃষ্টি হয়। হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং এর সৃষ্টি হয়েছিল নাকি তাঁর চোখের জল থেকে।

উপকথাগুলি থেকে অতি প্রাচীন পাঁচজন রাজার কথাও জানা যায়। চীনা সভ্যতার গোড়া পত্তন তাঁদের সময়েই হয়েছিল। কেমন করে শিল্পকর্ম করতে হয়, কি দিয়ে রেশম তৈরী করতে হয়, কি করে লিখতে হয় এইসব বিদ্যা তাঁরা চীনাদের শিখিয়ে ছিলেন। চীনা সঙ্গীত ও চিত্রকলা তাঁদেরই সৃষ্টি। এঁদের একজন ইট দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে শেখান এবং চুম্বক পাথর আবিষ্কার করেন। নক্ষত্র সম্বন্ধে জানবার জন্য তিনি এক মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আর একজন রাজা বন জঙ্গল কেটে এবং হোয়াংহো নদীর বন্যা রোধ ক'রে সেই জল চাষবাসের কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন।

প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা :—এই সময় চীনে ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও পাত্রের ব্যবহার ছিল। এইসব পাত্রের গায়ে তারা নানন জীব জন্তু ও শিকার ইত্যাদির চিত্র আঁকত। এইসব ব্রোঞ্জ ও মৃৎপাত্রের কারুকার্য্য দেখলে আরও আশ্চর্য্য লাগে। তারা সাদা মাটির সুন্দর সুন্দর বাসন-কোসন তৈরী করতে পারত। সে যুগে চীনেরা রেশমও গাছের আঁশ থেকে কাপড় বুনার কৌশল জানত। এরা ধান,

গম ও জোয়ারের চাষ করত কিন্তু লাঙ্গলের ব্যবহার জানত না। এদের লিপি ছিল চিত্রলিপি। এখনও চীনের লিপি চিত্রলিপিরই অনুরূপ। প্রাচীন চীনের অধিবাসীরা আকাশের দেবতা ও পৃথিবীর দেবতার পূজা করত। আমাদের মত এরাও বিশ্বাস করত আত্মার বিনাশ নেই, তাই আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় নিবেদন করত।

(৫)

নদী তীরবর্ত্তী উপত্যকায় গড়ে উঠা সভ্যতা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির বিবরণ

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহের অবস্থিতি পর্য্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে সবকটি সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল নদী তীরে বা কোন নদীকে কেন্দ্র করে তারই উপত্যকা ভূমিতে। সে যুগে নদী উপত্যকায় সভ্যতা গড়ে উঠার যথেষ্ট কারণও ছিল। এখন যেমন কোন নগর শহর বা শিল্পকেন্দ্রে গড়ে উঠার পিছনে নানা ভৌগলিক ও পরিবেশিক কারণ থাকে। অতি প্রাচীন কালে কিন্তু নদীই ছিল সভ্যতা গড়ে উঠার একমাত্র প্রয়োজনীয় ভৌগলিক পরিবেশ। যানবাহনের আদিম ও অনগ্রসর যুগে নদীই ছিল যাতায়াতের সবচেয়ে সহজ পথ। তাছাড়া প্রাচীন যুগে যন্ত্রশিল্প মানুষের আজানা ছিল, তাই কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। কৃষির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান নদীর ধারের জল সেচের সুবিধাযুক্ত উর্ব্বর জমি। তাছাড়া প্রতিরক্ষার জন্যও নদী খুব প্রয়োজনীয় ছিল। নদী পথে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব সুবিধা। এই কারণেই সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির সবগুলিই কোন না কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। টাইগ্রীস ও ইফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা, নীল নদের অববাহিকা প্রদেশে জন্ম নিয়েছিল মিশরীয় সভ্যতা, আর সিন্ধু নদের উপত্যকা অঞ্চলে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় এবং হোয়াংহো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছিল চীনের প্রাচীন সভ্যতা।

এই প্রাচীন সভ্যতাগুলির সবকয়টিই যে একই সময়ে গড়ে উঠেছিল তা নয়, তবে এগুলি প্রায় সমসাময়িক। তাছাড়া এগুলির মধ্যে বহু মিল দেখা যায়। এ সভ্যতাগুলির সব কয়টিতেই কৃষি ছিল প্রধান উপজীবিকা। পরবর্তী উপজীবিকা হিসাবে পশু পালনকেই উল্লেখ করা যায়। সবকয়টি স্থানেই মাটি খুঁড়ে যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যেও প্রচুর মিল দেখা যায়। মৃৎপাত্রের বহুল ব্যবহার সবকয়টি অঞ্চলেই ছিল এবং গঠন বৈশিষ্ট্যেরও মিল দেখা যায়। সিন্ধু-সভ্যতায় হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকায় গড়ে ওঠা দুটি স্থানেই মাটির জিনিষ তৈরীর জন্য কুমারের চাকের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সব দেশেই কারুকার্য্য ও চিত্র খচিত পাত্র ব্যবহৃত হত। ছোট জল পাত্র থেকে বড় বড় মাটির জালার মত পাত্র প্রায় সবকয়টি প্রাচীন সভ্যতাতেই পাওয়া গেছে। এ যুগের সভ্যতাগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোনটিতেই লোহা পাওয়া যায়নি। তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির বহু তৈজসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। সোনা, রূপা, তামা, পাথর, ঝিনুক ইত্যাদির সৌখিন কারুকার্য্য করা অলঙ্কার মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু ও চীনের ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে। সবকয়টি সভ্যতায় মাটির তৈরী পোড়া ইটের স্থাপত্য শিল্প আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থাপত্য শিল্পে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিকে দক্ষ ছিল। মিশর সমাধি মন্দিরে, মেসোপটেমিয়া প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণে, সিন্ধু-সভ্যতা নগর স্থাপত্যে উন্নত প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছে। লিপির ক্ষেত্রেও প্রাচীন মিশর ও চীন উভয় দেশেই চিত্র লিপির প্রচলন ছিল, যদিও দুটি মূলতঃ পৃথক।

দেবদেবী ও ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে মিল দেখা যায়। অধিকাংশ দেশেই বিভিন্ন জীবজন্তুকে দেবতারূপে পূজা করা হত। মহেঞ্জোদাড়োর শীলমোহরে এবং মিশরে প্রাপ্ত কাঠ ও পাথরের তৈরী মূর্ত্তিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া সব কয়টি দেশেই প্রাকৃতিক শক্তি, নদী, ভূমি ইত্যাদির পূজা বিধি

প্রচলিত ছিল। মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা সম্বন্ধে প্রায় একই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। মিশর ও চীনের প্রাচীন জনগণ বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ হয় না, তাই পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি উৎসর্গের রীতি ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগেও এই প্রাচীন সভ্যতাগুলির কয়েকটির মধ্যে সংযোগ ছিল। সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার সম্পর্ক ছিল। মেসোপটেমিয়ার আক্কাদে যে ভারতীয় বণিকদের একটি উপনিবেশ ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি আনুমানিক কত দিন পূর্বে বিকাশ লাভ করেছিল ?

২। কোন্ কোন্ নদীর তীরে প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি গড়ে উঠে ছিল ?

৩। সেই সভ্যতাগুলির নাম কর। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন কোন্‌টি ?

৪। কিলকলিপি কোন্ প্রাচীন সভ্যতায় প্রচলিত ছিল ? এটি কিসের উপর লেখা হ'ত ?

৫। সুমেরীয়দের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল ?

৬। সুমেরীয় শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

৭। মিশরের কয়েকটি দেবদেবীর বিবরণ দাও। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান কোন্ কোন্‌টি ?

৮। মিশরীয় দেবদেবী ও ধর্ম বিশ্বাসের সহিত সিন্ধু সভ্যতার দেবদেবী ও ধর্ম বিশ্বাসের কি কোন মিল আছে ?

৯। মামি কি ? মিশরীয়রা কেন মামি করত ?

১০। ফ্যারাও কি ? ফ্যারাওদের সমাধি মন্দিরকে কি বলা হয় ?

১১। মিশরীয় লিপি কিরূপ ছিল ? কিভাবে এটি পড়া গেল ?

১২। সিন্ধু সভ্যতার যুগের দুটি নগরের নাম কর ? এ দুটি কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে ?

১৩। সিন্ধু-সভ্যতা কতদিনের পুরাতন ? এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি ?

১৪। সিন্ধু-সভ্যতার নগর স্থাপত্যের বিবরণ দাও।

১৫। সিন্ধু-বাসীদের দেবদেবী ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয় দাও।

১৬। অপর প্রাচীন সভ্যতাগুলির চেয়ে সিন্ধু-সভ্যতাকে কোন্ দিক দিয়ে উন্নত বলা হয় ?

১৭। কতদিন আগে থেকে চীনের ইতিহাস পাওয়া যায় ? চীনের প্রথম মানুষ কে ?

১৮। চীনের লিপি কিরূপ ছিল ? এরা কোন্ কোন্ দেবদেবীর পূজা করত।

১৯। প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে প্রধানতঃ কি কি মিল দেখা যায় ?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :—

১। নীচের প্রশ্নগুলির দুটি করে উত্তর পাশে দেওয়া আছে যেটি ঠিক সেটি লিখ।

(ক) মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল— নীল নদের তীরে/হোয়াং-হো নদীর তীরে।

(খ) সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলিতে— তামার/লোহার, ব্যবহার ছিল।

(গ) মিশরের লিপিকে— হাইরোগ্লিফিক/কিউনিফর্ম লিপি বলে।

২। নীচেরগুলিকে পর পর সময় অনুযায়ী খৃষ্টাব্দ থেকে খৃষ্টপূর্বের দিকে সাজাও।

(ক) চীনের সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, হরপ্পার সভ্যতা।

(খ) পিরামিড, নিনেভের গ্রন্থালয়, মহেঞ্জোদাড়োর স্নানাগার।

(গ) অসুরবাণী পাল, টুটেনখামেন, পানকু।

৩। নীচের ভুল ঐতিহাসিক তথ্যগুলি ঠিক করে লিখ :—

(ক) ওসাইরিস ছিলেন চীনের দেবতা।

(খ) পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্পী হিসাবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অমর হয়ে আছেন।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) টাইগ্রীস ও —— নদীর মধ্যবর্তী স্থানে গড়ে উঠে সুমেরীয় সভ্যতা।

(খ) মিশরীয়দের সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলে ——।

৫। নীচের প্রশ্নগুলির তিনটি করে উত্তর পাশে দেওয়া আছে যেটি অধিক যুক্তিযুক্ত সেটি লিখ।

(ক) মিশরীয় সভ্যতা—নদী তীরবর্তী/তাম্রযুগের/সুপ্রাচীন সভ্যতা।

(খ) সুমেরীয় সভ্যতা ছিল—জ্যোতিষে উন্নত/শিল্পে সমৃদ্ধ/প্রাচীনতম।

যুগ রেখা (পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতা)

মেসোপটেমিয়া	মিশর	ভারতবর্ষ	চীন
মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার প্রথম উন্মেষ	মিশরীয় সভ্যতার উন্মেষ	সিন্ধু-নদের তীরের সভ্যতা, মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা	প্রাচীনতম সম্রাটদের যুগ
খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দ।	খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দ।	খৃঃপূঃ ২৭৫০-২৫০০ অব্দ।	খৃঃপূঃ ২৭০০-২২৫০ অব্দ।
সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ	মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ		সাং বংশ
খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ।	খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ।		খৃঃ পূঃ ১৭৬৬-১১২২ অব্দ।
হাম্মুরাবি	পিরামিডের যুগ		
খৃঃ পূঃ ২০৯০ অব্দ।	খৃঃ পূঃ ২৯০০-২৭৫০ অব্দ।		
	হিক্সস প্রাধান্য		
	খৃঃপূঃ ১৭৮০-১৫৫০ অব্দ।		
	৩য় থাটমোসের রাজত্বকাল		
	খৃঃ পূঃ ১৪৭৯ অব্দ।		

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগ

লোহা আবিষ্কার ও তার ব্যবহার ঃ— সুমের, মিশর ও সিন্ধু-উপত্যকা ইত্যাদি সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির বহু ধ্বংসাবশেষ থেকে বিভিন্ন রকমের ধাতুর জিনিষপত্র পাওয়া গেলেও লোহার তৈরী কোন জিনিষের নিদর্শন মেলেনি। খৃষ্ট জন্মের প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্ব্বেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে উন্নত মানব সভ্যতা বিকশিত হলেও; লোহার ব্যবহার শুরু হয় কিন্তু অনেক পরে। সম্ভবতঃ লোহার মত কঠিন ধাতুকে গলানোর কৌশল তারা আয়ত্ব করতে পারেনি। স্থাপত্য, শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সবদিকে এরা খুব উন্নত ছিল বটে, কিন্তু লোহার মত মজবুত ও স্থায়ী ধাতুকে তারা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেনি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে মানব জাতি উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলার প্রায় তিন হাজার বছর পরে লোহাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যরহার করতে শেখে। পৃথিবীর কোন্ দেশের মানুষ ঠিক কখন যে লোহার ব্যবহার শুরু করে একথা নির্দ্দিষ্ট করে বলা যায় না, তবে মেসোপটেমিয়া অসিরীয় সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লোহার অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ অসিরীয়রাই পৃথিবীতে প্রথম লোহা গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

আনুমানিক ১৮০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এশিয়া মাইনর ও ককেশাস অঞ্চলের অধিবাসীরা লৌহপিণ্ড গলিয়ে লোহা তৈরীর কৌশল আয়ত্ব করে। এইভাবে লোহা তৈরীর ব্যাপারে হিটাহিটদের প্রায় এক চেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। ১০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এইসব অঞ্চলে পূর্ণ লৌহ যুগের সূত্রপাত হয়। ৭০০-৬২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে অসিরীয়রা লোহাকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করে। অসিরীয় যোদ্ধারা লোহার অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। অসিরীয়ার প্রাচীন রাজধানী অসুর নগরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রচুর লোহার অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া

গেছে। এই নগরের একটি অস্ত্রশালা থেকেই সাড়ে পাঁচ হাজার মণ লোহার-অস্ত্র পাওয়া গেছে।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে আর্য্য যুগেই লোহার ব্যবহারের কথা জানা যায়। বেদে "অয়স" নামক একটি শক্ত ধাতুর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই ধাতুটিই "লোহা"। এ থেকে অনুমান করা যায় যে বৈদিক আর্য্য সভ্যতার যুগেও লোহার ব্যবহার ছিল। মহাকাব্যের যুগে যে লোহার ব্যাপক প্রচলন ছিল একথা রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লেখ আছে। আনুমানিক ১০৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ থেকে ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু হয় এবং ৫০০-২৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে চীনদেশে লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। চৌ রাজাদের আমলের শেষ দিকে চীনে লোহার ফলা যুক্ত লাঙ্গল ও অস্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

লোহা আবিষ্কারের ফলে মানুষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে এলো বিরাট পরিবর্তন। মানুষ লোহা আবিষ্কারের আগে কাঠের লাঙ্গল দিয়ে চাষ আবাদ করত। লোহা আবিষ্কারের ফলে লোহার তৈরী কোদাল, শাবল ও লোহার ফলা লাগান লাঙ্গল ব্যবহার শুরু করল ; কৃষিকাজ সহজ ও উন্নত হল। যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারেও লোহার অস্ত্রের ব্যবহার শুরু হল, কারণ অন্য যে কোন ধাতু অপেক্ষা লোহা তীক্ষ্ণ ও মজবুত। কর্মকার শ্রেণী লোহাকেই তাদের কর্মের প্রধান ধাতু বলে গ্রহণ করল। নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীও অনেক মানুষ তামা বা ব্রোঞ্জের বদলে লোহা দিয়ে তৈরী করতে আরম্ভ করল। ক্রমে লোহা গৃহ নির্মাণেও ব্যবহৃত হতে লাগল। কোন কিছু স্থায়ী ও মজবুত জিনিষ তৈরী করতে মানুষ ধাতুর মধ্যে প্রথমে লোহাকেই বেছে নিল।

রাজতন্ত্রের আবির্ভাব :—মানুষ যখন স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল তখন দলপতিরাই সেই জনপদকে পরিচালিত করতে লাগল। ক্রমে নিজেদের প্রয়োজনে ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ও জনপদ একসঙ্গে মিলিত হয়ে গেল এবং সেই দলপতি এই মানব

সমাজের উপর কর্তৃত্ব ও পরিচালনা করতে লাগল। মিশরীয়, সুমেরীয় প্রভৃতি সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস অনুধাবন করলে একথা বোঝা যায়। নগর সভ্যতার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ক্ষুদ্র জনপদ শহর ও নগরে রূপান্তরিত হল। তখনই হল রাজতন্ত্রের আরম্ভ। কিন্তু তখন রাজার জীবনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের বেশী তফাৎ ছিল না। দেশের আর দশজনের মত রাজাও ঘরের কাজ, ক্ষেতের কাজ করতেন। তবে যুদ্ধের সময় তাঁকে সেনাপতির কাজ করতে হত। পূজার সময় পুরোহিতের কাজ করতে হত। আবার প্রয়োজন হলে তিনি বিচারের কাজও করতেন। রাজার ছেলেই যে রাজত্ব পাবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। শক্তিমান পুরুষই রাজা হতেন। সে যুগটা ছিল জোর জবরদস্তির যুগ। এই রকম সমাজে জনসাধারণকে রাজার কথা মেনে নিতে হত। ক্রমে রাজা নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করলেন। শত্রুদের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী তৈরী হল ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

১ (ক)

ব্যাবিলন

মেসোপটেমিয়ায় গড়ে ওঠা সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন নগরীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই নগরীগুলি প্রত্যেকটিই স্বাধীন ছিল। প্রায়ই এই নগরীগুলির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ হত এবং একটি নগরী অন্যান্য নগরীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করত। এক সময় সুমেরীয়দের রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যাবিলন নামে একটি রাজ্য সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। এরা প্রথমে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশ জয় করে। এদের রাজধানীর নাম ছিল ব্যাবিলন। সেই নাম অনুসারেই রাজ্যটার নামও হয় ব্যাবিলন। ব্যাবিলন নগরই কালক্রমে সমগ্র মেসোপটেমিয়ার রাজধানীতে পরিণত

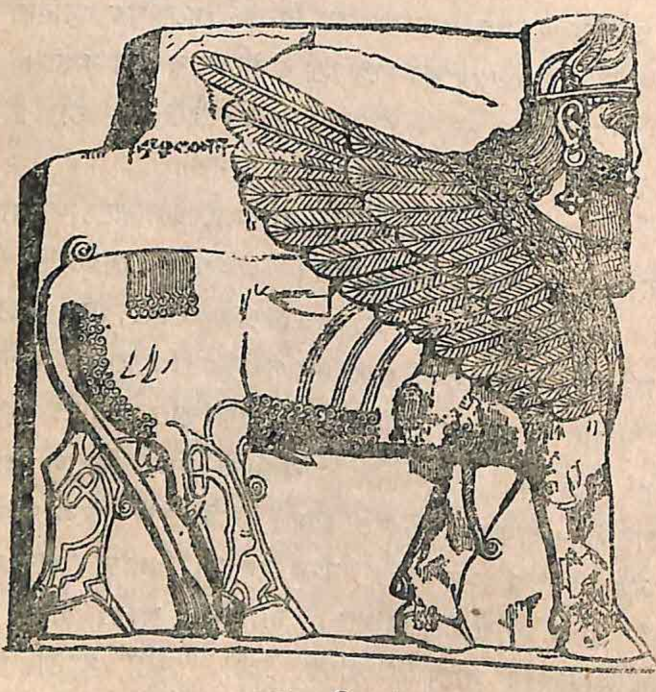
হয়। এদের রাজত্বকালে এখানকার সভ্যতার আরও উন্নতি হয়। ব্যাবিলন নগরকে ভিত্তি করেই এই সভ্যতা গড়ে উঠে বলে একে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বলা হয়।

কৃষি ও বাণিজ্য :—মেসোপটেমিয়ার উর্বর জমিতে ব্যাবিলনীয়রা সুমেরীয়দের থেকে উন্নত পদ্ধতিতে প্রচুর ফসল ফলাত। যব, বার্লি, গম তৈলবীজ, তুলা ইত্যাদি ছিল তাদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী থেকে খাল কেটে তারা কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করত। এখানে এত প্রচুর শস্য জন্মাত যে এরা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাড়তি শস্য বিদেশে রপ্তানি করত। সুমেরীয়দের থেকে ব্যাবিলনীয়রা শিল্প কর্মে আরও দক্ষ হয়ে উঠে। এরা সুতা ও পশমের সুন্দর বস্ত্র তৈরী করত। এদের পশমের তৈরী সুদৃশ্য ও টেকসই বস্ত্রের সমসাময়িক বিভিন্ন দেশে খুব চাহিদা ছিল। ব্যাবিলনীয়রা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বস্ত্র ও শস্যের ব্যবসা করত। বিভিন্ন দেশে তাদের উৎপন্ন শস্য ও তৈরী সামগ্রী বিক্রী করে তার বিনিময়ে তারা নানা জিনিষ নিজেদের দেশে নিয়ে আসত।

মন্দির ও পুরোহিত শ্রেণী :—ব্যাবিলনের সাধারণ অধিবাসীদের জীবনে মন্দিরের গভীর প্রভাব ছিল। রাজ্যে বহু দেবদেবীর মন্দির ছিল। অধিবাসীরা এই সকল মন্দিরের দেবদেবীকে ভক্তি ও ভয় করত। তাদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল গভীর। দেবদেবীর মন্দিরগুলি ছিল বিরাট কারুকার্য্য খচিত এবং সুন্দরভাবে বিভিন্ন মূল্যবান পাথরে সজ্জিত। ব্যাবিলনীয় মন্দিরগুলি ছিল বিশাল গম্বুজের মত তার উপর থাকত একটি করে ছাদ। এই ছাদ থেকে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র পরীক্ষা করা হত। নগর দেবতা হিসাবে "মারডুক" ও "বেল" ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ব্যাবিলন শহরে রাজা দ্বিতীয় **নেব্যুকাডনেজার** নামে এক রাজার তৈরী "বেল" দেবতার উদ্দেশ্যে নির্মিত মন্দিরটি ছিল সর্বাপেক্ষা সুন্দর। তাছাড়া "মারডুকের" থাকে থাকে গাঁথা সুন্দর মন্দিরটি ছিল শহরের মাঝখানে। ব্যাবিলনীয়দের সমাজ জীবনে পুরোহিতদের স্থান ছিল সবচেয়ে উপরে। মানুষের জীবনে

পুরোহিতদের প্রভাবও ছিল অপরিসীম। সমাজে কর্তৃত্বের একটা বিরাট অংশ পুরোহিতদের হাতে ছিল। সময় সময় তাঁরা রাজাদের উপরও তাঁদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব খাটাতেন। দৈনন্দিন ও ধর্মীয় জীবনে সাধারণ মানুষ পুরোহিতদের বিধান ও বিধিনিষেধকে দেবতা নির্দেশিত পথ বলে মনে করতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি :—ব্যাবিলনীয়রা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও যথেষ্ট উন্নত ছিল। ব্যাবিলনীয়দের সময়ে মেসোপটেমিয়া, শিল্প ও ভাস্কর্যে প্রভূত উন্নতি করেছিল। ব্যাবিলনীয়রা প্রাচীন সুমেরীয় লিখন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে। ত্রিকোনাকৃতি গোঁজের মত হরফে মাটির তালের উপর কাঠি দিয়া এঁরা লিখতে শুরু করেন। হামুরাবি লিপিতে এই হরফের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের সময়ে সাহিত্যের ও



দেবতা প্রেরিত ষাঁড়

বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। গিলগামেশের মহাকাব্য তাঁদের একটি অমূল্য গ্রন্থ। এতেই আমরা দেবতা প্রেরিত ষাঁড়ের কথা জানতে পারি।

প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে ব্যাবিলনেই গণিত ও জ্যোর্তিবিদ্যার সর্বপ্রথম চর্চা শুরু হয়। বিরাট বিরাট প্রাসাদ ও মন্দিরের ছাদে এঁরা গ্রহনক্ষত্রাদি দেখার ও পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রাচীন ব্যাবিলন খুব উন্নত ছিল। নগরগুলি বিরাট বিরাট প্রাসাদ, অট্টালিকা ও মন্দির শোভিত ছিল। শোভা ও সমৃদ্ধির জন্য সে যুগে ব্যাবিলন শহর সবচেয়ে সেরা ছিল। রাজা দ্বিতীয় নেব্যুকাডনেজার এই শহরটিকে নতুন করে নির্মাণ করেন। পরিখা ও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই শহরটির মাঝখান দিয়ে ইউফ্রেটিস নদী বয়ে যেত। নদীর উপরে ছিল প্রশস্থ ও সুদৃশ্য সেতু। শহরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবেশ দ্বারগুলি ছিল পিতলের তৈরী। রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও খুব চওড়া; আর রাস্তার দু'পাশে ছিল ইটের তৈরী বড় বড় বাড়ী; মধ্যে ছিল নগরদেবতা মারডুকের বিশাল গম্বুজাকৃতি মন্দির। নেব্যুকাডনেজারের বিশাল রাজ প্রাসাদটি ছিল অপূর্ব দর্শনীয় রং-বে রংয়ের মূর্ত্তি ও চিত্রে শোভিত। তাঁর দরবার কক্ষটি মূল্যবান প্রস্তরে এবং কারুকার্য্যে বিশেষ ভাবে সজ্জিত ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল **শূন্য উদ্যান**। রাজপ্রাসাদের এক কোনে রাজ-প্রাসাদের সমান উঁচু থামের উপর থাকে থাকে গাঁথা কতকগুলি চাতালের উপর এই উদ্যানটি তৈরী হয়েছিল। বাগানটিতে নানা রকম সুন্দর সুন্দর ছোট বড় ফুল ও ফলের গাছ সাজান ছিল। এটি প্রাচীন যুগের **সপ্তম আশ্চর্য্যের** মধ্যে একটি। রাজা নেব্যুকাডনেজার তাঁর পারস্য দেশীয় রাণীকে খুসি করবার জন্য এটি তৈরী করান বলে শোনা যায়। ব্যাবিলনীয় শিল্প ও স্থপতিরা যে সেই সুদূর অতীতেও উন্নত সৌধ-স্থাপত্য মূর্ত্তি নির্মাণ ও সূক্ষ্ম শিল্প কর্মে কত সুদক্ষ ছিল এইগুলি থেকে তা বোঝা যায়।

হামুরাবির আইনাবধি ও এর দ্বারা উদঘাটিত সমাজচিত্র :— খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রায় দু' হাজার বছর আগে হামুরাবি নামে এক রাজা ব্যাবিলনকে বিশেষ সমৃদ্ধ করে তুলেন। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে তাঁর অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। তিনি নিজ রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও

সুশাসনের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর এত খ্যাতি। তাঁর লেখা পঞ্চাশ খানি চিঠি পাওয়া গেছে। এই সকল চিঠি থেকে জানতে পারা যায় তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য কিরূপ পরিশ্রম করতেন। প্রাচীন কালের রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম দেশের প্রচলিত আইনকানুন সংকলন করেন। হামুরাবির কাছ থেকেই পৃথিবীর সভ্য মানুষ প্রথম লিপিবদ্ধ আইনকানুন পায়। হামুরাবির এই আইন বিধি প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ডে কীলকলিপিতে লেখা হয়েছিল। এই পাথরখানি পাওয়া গেছে। মাটির টালিতে লেখা এই বিধির প্রতিলিপিও পাওয়া গেছে। পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা হিসাবে হামুরাবি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

হামুরাবির আইনের মূল কথা ছিল **"চক্ষুর বদলে চক্ষু, দাঁতের বদলে দাঁত"** অর্থাৎ অপরাধী যে অপরাধ করবে ঠিক সেই ধরণের শাস্তি পাবে। নরহত্যা করলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে এবং যে ভাবে সে হত্যা করেছে তাকেও সেই ভাবেই হত্যা করা হবে। অপরাধীর অপরাধ করার পিছনের কারণগুলিকে ভালভাবে অনুসন্ধান ও বিচার বিবেচনা করার সুযোগ এতে ছিল না। কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরাধীকে অপরাধপ্রবন করছে কিনা, তাও দেখা হত না বা অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার কোন কথাই ভাবা হত না। এই আইনাবলীকে আজ নিষ্ঠুর বলে মনে হলেও এতে যুক্তি ও জ্ঞানের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

১ (খ)

সার্বভৌম শক্তি হিসাবে মিশর ; উপনিবেশিক আধিপত্য ও পুরোহিতগণের ক্ষমতা

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে এক এক জন রাজার অধীনে এক একটি নগর বা জনপদ গড়ে উঠল। এই জনপদগুলিই

নিজ পরিসর বাড়িয়ে রাজ্যে পরিণত হল। প্রত্যেকটি রাজ্যের ছিল এক একটি রাজধানী। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের প্রয়োজনও বাড়তে লাগল এবং নানাদিকে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে লাগল। তখন জীবনযাত্রার সুবিধা ও প্রয়োজনের তাগিদেই মিশরের বিভিন্ন রাজ্য ও জনপদগুলিতেও ক্রমে এক রাজার আধিপত্য স্থাপিত হল। এই কাজটা অবশ্য আপোষ আলোচনা বা পরামর্শ করে হয়নি, এর জন্যে অনেক লড়াই হয়েছে। কিন্তু এক রাজার অধীনে লোকের সুবিধা হয়েছিল বলেই ব্যবস্থাটা টিকে গিয়েছিল। মিশরীয়রা তাদের রাজাকে বলত **ফ্যারাও**।

উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক রাজার শাসনে আসার প্রায় দু' হাজার বছর পরে **হিকস্‌স** নামে আরব দেশের এক যাযাবর বর্বর জাতির দৃষ্টি পড়ে মিশরের উপর। এই যাযাবর জাতির লোকেদের ছিল ঘোড়া। মিশরীয়রা তখন ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। মিশরের পদাতিক সৈন্যবাহিনী হিকস্‌স রথীদের কাছে যুদ্ধে হেরে যায়। মিশর হিকস্‌স জাতির অধীনে চলে যায়। এই হিকস্‌সরা আনুমানিক পাঁচশ' বছর মিশর শাসন করে। হিকস্‌সদের শাসনে থাকাকালীন তাদের সংস্পর্শে এসে মিশরীয়রাও যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ হয়ে উঠে।

বিদেশী জাতি হিকস্‌সদের অত্যাচার ও শাসন মিশরীয়দের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়ে। তারপর দক্ষিণ মিশরের এক স্বাধীন রাজবংশ হিকস্‌সদের তাড়িয়ে দিয়ে মিশরকে স্বাধীন করে। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মিশরের সমৃদ্ধি বেড়ে চলে। ফ্যারাওরাও সামরিক শক্তিতে অধিক শক্তিশালী হয়। হিকস্‌স আমলে ইহুদী জাতির একটি দল মিশরে আশ্রয় নিয়েছিল। মিশর স্বাধীন হওয়ার পর বিদেশী বলে ফ্যারাওরা তাদের উপর নানারকম জুলুম আরম্ভ করে। ক্রীতদাসের মত সারাদিন তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। পালাবারও উপায় ছিল না, চতুর্দিকে ছিল মিশরীয়দের কড়া পাহারা। শেষে **মোশি** নামে এক নেতার কৌশলে সুয়েজ খাল পার হয়ে তারা পালাতে সক্ষম হয়। সামরিক শক্তিতে উন্নত হয়ে ফ্যারাওরা

মিশরের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারে চেষ্টা করে। আফ্রিকার সীমানার বাইরে পশ্চিম এশিয়ায় তাঁরা আপনাদের রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হন। এই সকল দিগ্বিজয়ী রাজাদের মধ্যে তৃতীয় থাটমোসের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে রাজা না বলে সম্রাট বলাই ভাল হবে। তাঁর সময়ে মিশরীয় সাম্রাজ্য আবিসিনিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কারণাকের মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিতে সম্রাট তৃতীয় থাটমোসের দিগ্বিজয়ের বিবরণ আছে। তাঁর যেমন শক্তিশালী স্থলবাহিনী ছিল তেমনই ছিল সুসজ্জিত রণতরী ও নৌবহর। তাঁর নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে (তখন যার নাম ছিল ইজিয়ান সাগর) কতকগুলি দ্বীপ জয় করেছিল। তাছাড়া মিশরীয় বাণিজ্য তরীও তখন ব্যবসায়ের জন্য নানা দেশে ঘুরে বেড়াত। সকল রাজ্যেরই উত্থান পতন আছে। এরপর মিশর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই সময়ে অসিরীয়ার অধীনস্থ হয়। আবার বেশ কয়েকশ' বছর স্বাধীন থাকার পর ইরাণীদের শাখা পারসিক জাতির অধীনস্থ হয়। তারপর মিশরে গ্রীক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে মিশর রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পারস্য সম্রাট **ক্যামবাইসেস** মিশর জয় করেন। পারসিকদের অধিকারে থাকার সময় পারসিক রাজ দারায়ুসের মৃত্যুর পর মিশরে বিদ্রোহ দেখা দেয় কিন্তু নতুন রাজা **জেরেক্সেস** মিশরের বিদ্রোহ দমন করেন। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিশরে প্রবেশ করলে মিশরীয়রা বিনা আপত্তিতে তাঁকে ফ্যারাওর সিংহাসনে বসান।



মিশররাজ
তৃতীয় থাটমোস

পুরোহিতগণের ক্ষমতাঃ—যে দেশে কুসংস্কার যত বেশী, দেবতা ও পরলোকে যত বিশ্বাস, সে দেশে পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য তত বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। মিশরেও পুরোহিত শ্রেণী অত্যন্ত

ক্ষমতা ও প্রভাবশালী ছিল। তাছাড়া মিশরে পুরোহিতেরাই ছিলেন লেখাপড়া জানা পণ্ডিত। সুতরাং ধর্ম ও শিক্ষা দুটিই পুরোহিত সম্প্রদায়ের অধীনে ছিল। মন্দিরের পাশেই থাকত শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়। সেখানে পুরোহিতেরাই নৈতিক ও লৌকিক জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। দেবতার সম্পত্তি তত্বাবধানও তাঁরাই করতেন। আধিপত্য, সম্মান ও ভোগবিলাসে পুরোহিতেরা কোন অংশেই ফ্যারাওদের থেকে কম ছিলেন না। পুরোহিতদের নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য বহু দেবোত্তর সম্পতি ছিল। তাঁদের সেবায়, গৃহকর্ম ও কৃষি ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকত অসংখ্য গোলাম ও ক্রীতদাস। এ থেকে বুঝা যায় যে মিশরীয় সমাজ ব্যবস্থায় পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১ (গ)
ইরাণ

আর্য্যজাতির একটি শাখা যেমন পূর্ব পুরুষদের বাসভূমি ছেড়ে ভারতে আসে তেমনি আর একটি শাখা ইরাণে বসবাস শুরু করে। এদের আবার দুটি শাখা **মেড ও পারসিক**। এখন থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে মেড আক্রমণে অসিরীয়ার রাজধানী নিনেভের ধ্বংস হয়। কিন্তু মেড রাজত্ব বেশীদিন টিকেনি। নিনেভের পতনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই রাজা **কাইরাসের** (কুরুস) নেতৃত্বে পারসিক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়।

পারসিক সাম্রাজ্যের উত্থান :—তখন এশিয়ামাইনরের অধিকাংশ লিডিয়ার রাজা ক্রিসাসের শাসনে। পারস্য শক্তির উত্থানে তিনি উদ্বিগ্ন হন। পারস্য শক্তি নষ্ট করার জন্য তিনি মিশর ও ব্যাবিলনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন, ফলে কাইরাসের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়, লিডিয়ার পরাজয় ঘটে। ক্রমে ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া ও ইহুদী দেশ জয় করে কাইরাস ভারতের দিকে অগ্রসর হন। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে কাইরাস হিন্দুকুশ পর্বত পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। ক্রমে পারস্য

সাম্রাজ্য সিন্ধুনদ থেকে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর পুত্র ক্যামবাইসেস মিশর জয় করেন; ফলে পারস্য সাম্রাজ্য নীলনদের উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

দারায়ুস :—সম্রাট দারায়ুস ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বেহিস্তুনের পর্বতের গায়ে খোদিত তিনটি প্রাচীন ভাষায় লিখিত লিপি থেকে দারায়ুসের দিগ্বিজয়ের বিবরণ জানা যায়। দারায়ুস এক প্রবল নৌবাহিনী গঠন করেন। তাঁর নৌ-সেনাপতি স্কাইলাক্স সিন্ধুনদের তীর থেকে সুয়েজ উপসাগর পর্য্যন্ত জলপথ জরীপ করেন। তিনি শকজাতির উপদ্রব দমনের জন্য রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অভিযান করেন। তাঁর এই অভিযান সফল হয়নি।

ম্যারাথনের যুদ্ধ :—প্রথমবার দারায়ুস দার্দানেলিস প্রণালী পার হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করতে না পারার জন্য স্থির করেন জলপথে সোজাসুজি ইজিয়ান সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গ্রীস আক্রমণ করবেন। গ্রীসে অবতরণ করে গ্রীসের একটি ছোট শহর জ্বালিয়ে দিয়ে তিনি এথেন্সের দিকে অগ্রসর হন। এথেন্সের সেনাপতি মিলিটাইডিস্ পারসিকদের নগরে পৌঁছতে না দিয়ে কিছু দূরে ম্যারাথনের মাঠে তাদের বাধা দেন। মিলিটাইডিসের রণকৌশলে গ্রীকদের কাছে দারায়ুস পরাজিত হন। সে রাত্রে যুদ্ধের ফলাফল কি হোল জানবার জন্য নগরের লোকেরা ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। যুদ্ধ জয়ের খবর নিয়ে একজন যোদ্ধা **ফিডিপ্পিডিস্** এক দৌড়ে এথেন্সে ফিরে আসেন এবং নাগরিকদের দুশ্চিন্তা দূর করেন। এর আগেই তিনি সাহায্যের জন্য এথেন্স থেকে ১৫ মাইল দূরে স্পার্টায় গিয়ে, ফিরে এসেছিলেন দু'দিনে। আবার ম্যারাথনে গিয়ে যুদ্ধও করেছিলেন। যুদ্ধ জয়ের খবর নিয়ে ফিরে এসেই তিনি মারা যান। **অলিম্পিক খেলাধূলায়** একটি দৌড় প্রতিযোগিতা আছে তার নাম **"ম্যারাথন রেস।"** ফিডিপ্পিডিসের স্মৃতির সঙ্গে এটি জড়িত। দারায়ুসের মৃত্যুর পর জেরেক্সেস্ সম্রাট হন। তিনি দার্দানেলিস

প্রণালীর উপর জাহাজ দিয়ে সেতু রচনা করে, এথেন্সের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর নৌবহর এগিয়ে চলে ইজিয়ান সমুদ্রের উত্তর ও পশ্চিম উপকূল ধরে।

থার্মোপিলীর যুদ্ধ :—এথেন্সের বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি থেমিস্টক্লিসের পরামর্শে ঠিক হয় গ্রীক সেনাদল যতদিন সম্ভব পারসিক



থার্মোপিলীর যুদ্ধ

বাহিনীর গতিরোধ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু আসল যুদ্ধ হবে সমুদ্রে। এথেন্সের বন্ধু রাষ্ট্র স্পার্টার রাজা লিওনিদাস থার্মোপিলীর গিরিসংকটে মাত্র ৫০০ সৈন্য নিয়ে পারসিকদের বাধা দিতে অগ্রসর হন ও সেখানে অপেক্ষা করেন। সেই সংকীর্ণ পথে অনায়াসে তিনি পারসিকদের গতিরোধ করেন। পারসিকরা গোপন পথে পাহাড় পার হয়ে পিছন দিক থেকে স্পার্টানদের আক্রমণ করেন। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও স্পার্টার তিনশ সৈন্য কিছুতেই পারসিকদের পথ ছেড়ে দিলেন না। সমস্ত সৈন্যদল একেবারে নির্মূল হলে তবেই পারসিকরা থার্মোপিলী পার হতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে স্পার্টানদের এই দেশপ্রেম ও বীরত্ব অমর হয়ে আছে। সালামিসের যুদ্ধে পারসিক নৌবহর

সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। জেরেক্সেস্ পরাজিত হন। এরপর থেকেই পারস্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

জরথুষ্ট্র প্রবর্ত্তিত ধর্ম :—প্রায় তিন হাজার বছর আগে জরথুষ্ট্র নামে এক মহাপুরুষ ইরাণে বসবাসকারী আর্য্যদের মধ্যে এক নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। ইরাণীরা প্রথমে যে সব দেবদেবীর পূজা করতেন তার সঙ্গে ভারতের বৈদিক আর্য্যদের দেবতাদের অনেক মিল ছিল। প্রাচীন ইরাণীদের ধর্মগ্রন্থ **আভেস্তা**।

জরথু ষ্ট্রর প্রবর্ত্তিত ধর্মের মূল কথা :—মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলছে। পৃথিবীতেও ভাল মন্দ দুটি শক্তি সর্বদা কাজ করছে। কল্যাণ শক্তির প্রভাবে ফসল জন্মাল আবার অকল্যাণ শক্তির প্রভাবে তা নষ্ট হল। তাঁর মতে মঙ্গলময় দেবতার নাম **আহুর মাজদা**, আর অমঙ্গলের দেবতার নাম **"অহ্রিমান"**। মানুষ যদি সৎপথে থাকে, সদাচরণ করে, অন্যায় না করে, অসত্য না বলে তাহলে আহুর মাজদার পূজা করা হবে। কল্যাণ শক্তির জয় হবে। আর যদি অসাধু হয় তবে অহ্রিমানের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। জরথুষ্ট্রপন্থীরা



জরথুষ্ট্র

অগ্নিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। যদিও প্রকৃত পক্ষে তাঁরা অগ্নির উপাসক নন। অগ্নি তাদের কাছে কল্যাণ ও আলোকের প্রতীক হিসাবে বিশেষ পবিত্র। প্রাচীন মানুষের পক্ষে আগুন জ্বালান কষ্টসাধ্য ছিল তাই তারা আগুন নিভাতে দিত না। জরথুষ্ট্র-পন্থীদের মধ্যে আগুন অনির্বাণ রাখার প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের ভারতে পার্শীরা জরথুষ্ট্রের শিষ্য। পার্শীরাও অগ্নি প্রজ্বলিত রাখাকে

পবিত্র বলে মনে করেন। তাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা বা কবর দেওয়ার প্রথা নেই তার বদলে তারা মৃতদেহকে কোন ফাঁকা জায়গায় রেখে দেয়, পশু পাখীরা মৃতদেহের মাংস খেয়ে যায়। হয়ত মৃত্যুর পরও দেহ জীবের সেবায় লাগবে বলেই এই প্রথা। এই অদ্ভুত প্রথা সম্বন্ধে জরথুষ্ট্রপন্থীরা মনে করেন যে আর্য্যদের ইরাণে আসার সময় পথে তাদের কিছু লোকের মৃত্যু হয়। এই মৃতদেহগুলির কোন সৎকার হয়নি। পথে জন্তু-জানোয়ারেই খায়। তাই ইরাণে বসতি স্থাপন করার পরও তাদের মধ্যে এই প্রথাই রয়ে যায়। বর্তমানে জরথুষ্ট্রপন্থীরা তাঁদের মৃতদেহগুলি গৃহের উঁচু ছাদে ফেলে রাখেন। এই সমস্ত গৃহকে বলে **"নীরবতার গৃহ"**। তেরশ' বছর আগে যখন ইসলাম ধর্ম ইরাণে প্রবেশ করে তখন বহু জরথুষ্ট্রপন্থীরা ভারতে আসেন। তাঁরা প্রধানতঃ বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলে বাস করেন।

১ (ঘ)

ইহুদী জাতি

মিশরে হিব্রুজাতির ইতিহাস :—প্রায় তিন হাজার বছরের কিছু আগে হিব্রু বা ইহুদী নামে একটি জাতি আরবের মরুভূমির মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। কালক্রমে তারা প্যালেষ্টাইনের উর্বর ভূমিতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। তাদের অতীত জীবন দুঃখ ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে কাটে। সেইজন্য সংখ্যায় এরা অন্য জাতির তুলনায় আজও অল্প।

হিকস্‌স নামে একটি যাযাবর জাতির লোকেরা তাদের নিজ বাস ভূমি থেকে বিতাড়িত করে। দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদীরা মিশরে আশ্রয় লয়। মিশর স্বাধীন হওয়ার পর তাদের দুঃখ কষ্ট খুব বেড়ে যায়। বিদেশী বলে ফ্যারাওরা তাদের উপর নানারকম অত্যাচার ও জুলুম আরম্ভ করে। মিশরীয়রা তাদের বহুদিন ধরে পিরামিড ও

মন্দির নির্মাণের কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করে রাখে। তাদের ইটখোলায় ও রাজপথে সমস্ত দিন খাটতে হত। কাজে একটু ত্রুটি হলেই মিশরীয়রা নির্মম ভাবে চাবুক মারত। অথচ মিশর থেকে পালাবার কোন উপায় ছিল না। পথে পথে ছিল সৈনিকদের কড়া পাহারা। এই নির্য্যাতনে ইহুদীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।

হিব্রুগণের মিশর হইতে পলায়ন :—এই সময়ে তাদের মধ্যে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। এর নাম **মোজেস**। মোজেস ফ্যারাওদের কবল থেকে ইহুদীদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন তিনি ইহুদীদের নিয়ে মিশর থেকে রওনা হলেন। কিন্তু ফ্যারাও নানাভাবে ইহুদীদের বাধা দিতে লাগলেন। শেষে সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন তাদের ধরে আনতে। ততক্ষণ সীমান্ত প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে ইহুদীরা লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ পিছনে দেখা গেল অগণিত মিশরীয় সৈন্য। ইহুদীরা প্রমাদ গণল। সামনে সমুদ্র, পালাবার পথ নেই। মোজেস তখন তাঁর হাতখানি জলের উপর ধরলেন। কি আশ্চর্য্য! সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র ছু' ভাগ হয়ে মাঝখানে পথ দেখা দিল। ইহুদীরা ছুটে সমুদ্র পার হতে লাগল। এদিকে ফ্যারাওয়ের সৈন্যরা তাদের পিছনে ধাওয়া করে চলল সমুদ্রের মাঝের পথ ধরে। ইহুদীরা সকলে তীরে পৌঁছান মাত্র মোজেস আবার তাঁর হাতখানি জলের উপর ধরলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ছু' ভাগ হয়ে যাওয়া জলও এক হয়ে গেল, আর ফ্যারাওয়ের সৈন্যরা সব জলে ডুবে মারা গেল। এই কাহিনী সম্ভবতঃ উপকথা মাত্র। তবে এ থেকে বোঝা যায় যে মোজেস নানা কৌশলে নিজ স্বজাতিদের নিরাপদে সুয়েজ খাল পার করে, মিশরীয়দের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন।

ক্রীতদাসত্বের মুক্তি ও প্যালেষ্টাইনে বসতি স্থাপন :— মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে মোজেস ইহুদীদের সঙ্গে নিয়ে তার বাঞ্ছিত দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মোজেস ইহুদীদের

দুঃখের দিনে একমাত্র ভগবান যিহোবার উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছিলেন।

মোজেস ইহুদীদের নিয়ে বহু কষ্ট সহ্য করে বহু দেশে ঘুরে বেড়ান, যিহোবা নির্দেশিত রাজ্যের সন্ধানে। তিনি নিজে কিন্তু সেই দেশে পৌঁছাতে পারেননি। বাঞ্ছিত দেশকে দেখে ছিলেন মাত্র। অবশেষে ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে পৌঁছায়। এই দেশের শোভা দেখে তাদের মনে হল এটিই যিহোবার নির্দেশিত দেশ। এখানেই তিনি তাদের নিয়ে আসবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্যালেষ্টাইনে তখন কানানাইটদের বাস। যাযাবর ইহুদীদের তুলনায় কানানাইটরা অনেক বিষয়েই উন্নত ছিল। কানানাইটদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইহুদীরা প্যালেষ্টাইন দখল করে। তাদের সংস্পর্শে এসে ইহুদীরা সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়।

এই দেশে ইহুদীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হল ফিলিস্তিনরা ; এদের আদিবাস ক্রীট দ্বীপে। সভ্যতা ও যুদ্ধ বিদ্যায় এরাও ইহুদীদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং ইহুদীরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হল এবং একজন রাজার কর্তৃত্ব স্বীকার করল।

প্রায় তিন হাজার বছর আগে ইহুদীদের রাজা ছিলেন সল। তখনও ইহুদীদের কোন রাজধানী ছিল না। পরবর্তী রাজা দায়ূদ জেরুজালেমের কানানাইট দুর্গ অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ফিলিস্তিনদের পরাজিত করে এক বিস্তৃত ইহুদীরাজ্য স্থাপন করেন। দায়ূদের পর তাঁর পুত্র সুলেমান রাজা হন। ন্যায় বিচারের জন্য এর খ্যাতি ছিল। সুলেমানের মৃত্যুর পর ইহুদীরাজ্য দুভাগ হয়ে যায়। উত্তর ভাগের রাজ্যটির নাম ছিল ইস্রায়েল। এই রাজ্যটি ছিল সমৃদ্ধিশালী। দক্ষিণভাগের রাজ্যের নাম ছিল জুডিয়া। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশেরই মেষপালকের জীবিকা ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজার জেরুজালেম আক্রমণ করে ইহা ধ্বংস করেন। তিনি ইহুদীদের বন্দী করে ব্যাবিলনে

নিয়ে যান। বহুদিন ব্যাবিলনের বন্দীশালায় থাকবার পর তারা পারস্ত সম্রাট কাইরাস কর্তৃক মুক্ত হয়। মুক্তিলাভ করে তারা জেরুজালেমে ফিরে যায় এবং নূতন করে ঐ দেশ গড়ে তোলে। তারা রাজার বদলে যিহোবার মন্দিরের পুরোহিতকেই তাদের সর্বময় কর্ত্তৃত্বের ভার দেয়। তাদের বন্দীত্ব ও দাসত্বের মুক্তি ঘটে।

ইহুদীরা কিন্তু বেশীদিন স্বাধীন থাকতে পারেনি। আবার স্বাধীনতা হারাবার পর তারা পৃথিবীর নানা সভ্যদেশে ছড়িয়ে পড়ে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদীরা আবার নিজদেশে ফিরে ইস্রায়েল নামে রাজ্য গঠন করেছে।

(২)

গ্রীস

ক্রীট দ্বীপের সভ্যতা :—যারা প্রাচীন আর্য্য ভাষায় কথা বলত গ্রীক জাতি তাদেরই একটি শাখা। এই জাতি গ্রীসে আসবার আগে ইজিয়ান সমুদ্রের ধারে এবং ক্রীট দ্বীপে এক বিশিষ্ট সভ্যতা বিস্তার লাভ করে ছিল। এই সভ্যতা ইজিয়ান বা ক্রীটান সভ্যতা নামে পরিচিত। এই সভ্যতা মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার মত উন্নত ছিল। আর্য্যরা গ্রীসে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তবুও অতীতের ধ্বংস স্তূপ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক যে সব নিদর্শন বেরিয়েছে তা দেখে অবাক হতে হয়।

হোমারের যুগ :—গ্রীক চারণদের কাছ থেকেই পরবর্ত্তী সভ্যজগৎ প্রাচীন গ্রীসের দুটি মহাকাব্য **ইলিয়ড ও ওডেসির** সন্ধান পায়। আমাদের দেশের রামায়ণ, মহাভারত এই দুটি মহাকাব্য থেকে আমরা যেমন আর্য্যদের জীবন যাত্রার অনেক খবর জানতে পেরেছি, তেমনি এই মহাকাব্য দুটি থেকেও গ্রীসের বহু বিবরণ জানা গেছে। প্রচলিত

প্রবাদ অনুসারে **হোমার** নামে এক অন্ধ মহাকবি এই দুটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।

গ্রীকরা ফ্রিজিয়ান নামে এক জাতির লোকেদের ট্রয় নামে একটি সুন্দর ও শক্তিশালী নগর আক্রমণ করেছিলেন। ট্রয়ের যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই এই দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছে। এই মহাকাব্য দুটি থেকে প্রাচীন গ্রীকদের সমাজ ও সভ্যতার নিখুঁত ছবি আমরা পাই।

নগর রাষ্ট্র :—গ্রীকরা প্রথমে গ্রাম্য জীবনযাপন করত। ক্রমে তারা নগর গড়ে বাস করতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ রাষ্ট্রে রাজাই ছিলেন প্রধান বিচারক, ধর্মকার্য্যের প্রধান ব্যক্তি এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু রাজার পদলাভের জন্য তাঁকে অভিজাতদের মত নিতে হত। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতীয় বিপদের সময় তাঁরা রাজাকে ক্ষমতা দিতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা পরামর্শ অপব্যবহার করলে অভিজাতরা তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারতেন। রাজার সিদ্ধান্ত শুনবার জন্য সাধারণ লোকেরা একটি পরিষদে মিলিত হত। যদিও প্রত্যেক সিদ্ধান্তে তাদের সম্মতি বা অসম্মতি জানাবার অধিকার ছিল না, তবুও সাধারণ লোকের মতের যথেষ্ট গুরত্ব দেওয়া হত; কারণ অধিকাংশ সৈন্য সামন্ত তাদের মধ্য থেকেই সংগ্রহ করা হত। কালক্রমে অভিজাতদের ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অধিকাংশ গ্রীক রাষ্ট্র থেকেই রাজতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়।

সমাজ, সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিকতা :—হোমারের যুগে গ্রীকরা প্রধানতঃ চাষবাস ও পশুপালনের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করত। তখনকার দিনে তাদের প্রয়োজনও খুব কম ছিল। প্রত্যেকেরই প্রচুর গৃহপালিত পশু ও জমি ছিল, আর ছিল নানান ফলের বাগান। বড় বড় যবের ক্ষেত্র ছিল। প্রাচীন গ্রীক সমাজে বাড়ীর কর্তাই ছিলেন সর্বেসর্বা। পরিবারের সকলেই তাঁর কথা মেনে চলত। মেয়েরা চরকা কাটত তাঁত বুনত আর সেলাই করত। গ্রীকরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ অধিকার করে, সেই দেশ থেকে মানুষ ধরে ক্রীতদাস করে রাখত।

নানা রকম খেলাধূলার মধ্য দিয়ে গ্রীকদের একতাবোধ প্রকাশ পেত। এইসব খেলাধূলার মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। এই প্রতিযোগিতা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে। আজও সেই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

গ্রীক দেবদেবী ঃ—আমাদের দেশের লোকের ধারণা যে কৈলাশ পর্বতে আমাদের দেবতা শিব ঠাকুর থাকেন। তেমনি গ্রীকরা মনে করত যে তাদের দেব-দেবীরা বাস করেন অলিম্পাস পর্বতে। গ্রীক দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস। এথেনা ছিলেন গ্রীক রাষ্ট্র এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ্যাপোলো সূর্য্যের দেবতা, গীতবাদ্য ও শিল্পকলার ওস্তাদ ও ত্রিকালজ্ঞ। ডেলফি নামক স্থানে এ্যাপোলো দেবতার মন্দির ছিল। এ্যাপোলো জিউসের বাণী মানুষকে শুনিয়ে ছিলেন। এই এ্যাপোলোর মন্দিরে বিভিন্ন গ্রীকরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ের আলোচনা করতেন।

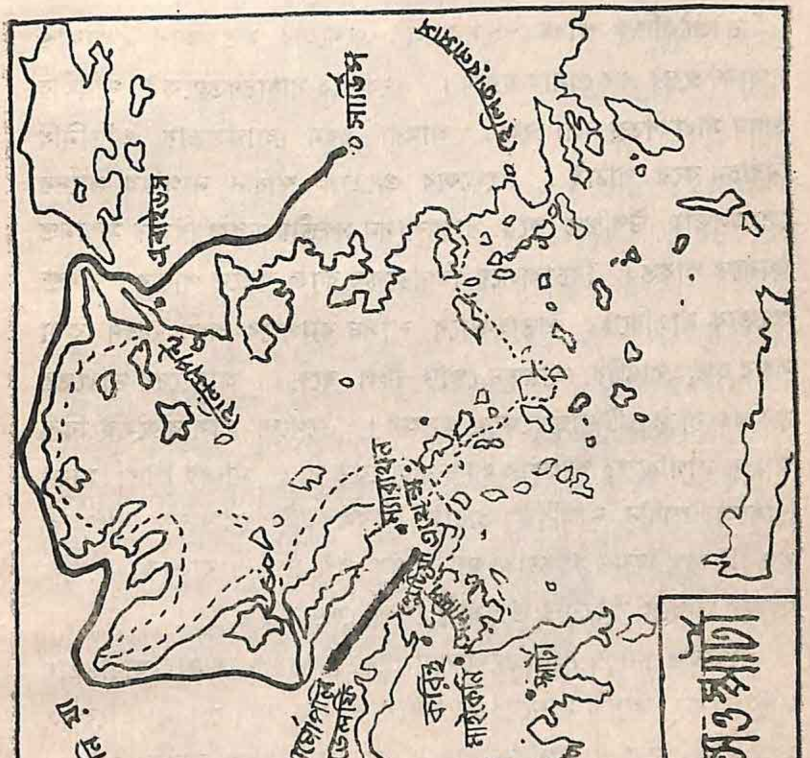


গ্রীক দেবতা এ্যাপোলো

এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন
এবং
তুলনামূলক আলোচনা

গ্রীসের নগর রাষ্ট্র ঃ- মহাকাব্যের যুগে গ্রীকদের বংশধরেরা মিশর ও ব্যাবিলনের সংস্পর্শে এসে আরও সভ্য হয়ে উঠে। কিন্তু তারা একই শাসনে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি শুধু প্রাকৃতিক কারণে। দেশের মাঝখানে পাহাড় পর্বত থাকার ফলে গ্রীস দেশটি বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নগরীতে বিভক্ত ছিল। এক একটি নগরী ছিল এক একটি রাষ্ট্র। এই

রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ এবং থিব্‌স। বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। কোথাও ছিল গণতন্ত্র অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক নিজেরাই সরাসরি শাসন কার্য্য চালাত। আবার কোথাও ছিল অভিজাত শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা এবং কোন কোন রাষ্ট্রে ছিল রাজতন্ত্র যদিও এই রাজতন্ত্র নাগরিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।



প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা ছিল

সবচেয়ে বিখ্যাত। এদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অবস্থা জানলে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ ও প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত। কেবল বিদেশীদের আক্রমণের সময় এই বিবাদ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকত।

এথেন্স

রাজনৈতিক জীবন :—সেকালে এথেন্সের মত আর কোথাও সাধারণতন্ত্রের এত প্রসার হয়নি। এথেন্সের সাধারণতন্ত্রকেই পৃথিবীর প্রথম সাধারণতন্ত্র বলা চলে। আমরা এখন লোকসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাই। এথেন্সের প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিক তাদের লোকসভায় উপস্থিত হয়ে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে মতামত জানতে পারত। বিচারালয়ে বিচারকের কাজ করতে পারত। অবশ্য প্রত্যেক নাগরিকের প্রত্যক্ষভাবে শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হত, রাষ্ট্রটির আয়তন ছোট ছিল বলে। আমাদের ভারতের মত বড় রাষ্ট্রে এটি বাস্তবক্ষেত্রে অসম্ভব। এথেন্সে বাস করলেই কিন্তু স্বাধীন নাগরিকের অধিকার লাভ করা যেত না। যাদের পিতা মাতা এথেন্সের স্বাধীন নাগরিক তারাই কেবল এই গৌরবের অধিকারী হত। নাগরিকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব খুব বেশী ছিল। বাল্যকাল থেকে তাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হত।

এথেন্সের গৌরব ছিল, এথেন্সবাসীদের চিন্তার ও শিক্ষার স্বাধীনতায় রাষ্ট্রের কোন কর্তৃত্ব মানুষের সাংস্কিতক জীবনে দেখা দেয়নি। কেবল মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক ও নাগরিক জীবনে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল।

এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থা :—এথেন্সবাসীরা শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন যুগের প্রবর্তন করে। শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। এথেন্সে কোন সরকারী বিদ্যালয়ও ছিল না। পেশাদার শিক্ষকরা নিজেরা স্কুল খুলতেন, ছাত্র পড়াতেন। একজন শিক্ষকই সব বিষয় পড়াতেন। সেখানে সাহিত্য, ইতিহাস, গান-বাজনা ও চিত্র

অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম বা শরীর চর্চাও শেখান হত। মেয়েরা স্কুলে যেত না, তারা বাড়ীতে সামান্য লেখাপড়া এবং ঘরের কাজকর্ম, গানবাজনা, সুতাকাটা, তাঁত বুনা, সূঁচের কাজ ইত্যাদি শিখত। ষোল বছর বয়সে ছেলেরা সামরিক শিক্ষার জন্য তৈরী হত। এই সময়ে তারা ব্যায়াম ছাড়াও কুস্তি করতে, রথ চালাতে এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শিখত। আঠার বছর বয়স হলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষানবিশী শুরু হত। তখন তারা সেনাদলে যোগ দিত ও নাগরিকের কর্ত্তব্য শিখত। সঙ্গে সঙ্গে শিখত কুচকাওয়াজ করা আর জ্যামিতি, সাহিত্য ও সঙ্গীতবিদ্যার পাঠ নিত।

এথেন্সের নাগরিক জীবন :—এথেন্সের নাগরিক জীবন ছিল খুবই সরল। পুরুষেরা প্রায়ই বাড়ীর বাইরে বাজারে রাস্তায় বা দোকানে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করে দিন কাটাত। এদের বসত বাড়ীতে আয়েস আরামের বিশেষ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বাস-গৃহও যে খুব উন্নত ধরণের ছিল এমন মনে হয় না। রাস্তার দিকের দেয়ালে একটি মাত্র দরজা। খোলা উঠানের ধারে কয়েকখানা ঘর, তাতেই সামন্যই আসবাবপত্র। সেখানে মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করত। ক্ষেত খামারের কাজ, ঘর-সংসারের কাজ সমস্তই ক্রীতদাসেরা করত। বিকালে অনেক সময় তারা দেশের আইন কানুন তৈরী করবার জন্য সভাসমিতিতে যোগ দিত আবার অনেকে মামলা মোকর্দ্দমায় জুরিতে যোগ দিয়ে বিচারে সাহায্য করত।

স্পার্টা

এথেন্সের মত গ্রীসের আর একটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রনগরী ছিল স্পার্টা। এটিও শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা ও সামাজিক দিক দিয়ে খুব উন্নত ছিল।

স্পার্টার রাজনৈতিক জীবনঃ—স্পার্টায় ছিল রাজতন্ত্র তবে রাজার

ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। স্পার্টার মানুষের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যেকটি মানুষের এবং সমাজের উপর রাষ্ট্রের কঠোর শৃঙ্খলার বন্ধন। প্রত্যেক নাগরিকের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত নানারকম নিয়মের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। রাষ্ট্রে যুদ্ধকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু বলে মনে করা হত, তাই রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল পেশাদার সৈনিক তৈরী করা। লাইকারগাস নামে একব্যক্তি অতি প্রাচীনকালে স্পার্টার জীবনে এরূপ কঠোর নিয়ম কাননগুলি প্রবর্তন করেন। স্পার্টায় বিদ্যা বুদ্ধির তেমন আদর ছিল না। আদর ছিল শক্তির, সাহসের ও কষ্ট সহিষ্ণুতার। তিরিশ বছর বয়সে স্পার্টার যুবক বিয়ে করতে পারত, কিন্তু খর্বকায় অথবা দুর্বল নারীকে বিয়ে করলে দুর্বল সন্তান জন্মাবে, তাই দুর্বল নারীকে বিবাহ করলে শাস্তি পেতে হত।

সামাজিক জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রত্যেক স্পার্টাবাসী সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকতে পারত। তারপর বালকের শিক্ষার ভার নিত রাজ্যের সরকার। তারা তখন মাতাপিতার কাছ থেকে সৈনিকদের ব্যারাকে চলে যেত। এই বয়সেই তাদের সামরিক শিক্ষা আরম্ভ হত। তারপর সাত বছর থেকে কুড়ি বছর পর্য্যন্ত তাদের শরীর চর্চা ও যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে হত। এই শিক্ষা ব্যবস্থা খুব কঠোর ছিল। শিক্ষা বিষয়ে শুধু সামরিক দিকে জোর দেওয়ায় ও কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তনের জন্যে স্পার্টাতে এথেন্সের মত কোমল বৃত্তি-গুলির চর্চা করার সুযোগ ছিল না। মেয়েদের শরীর চর্চার দিকেও জোর দেওয়া হত, কারণ বীর নাগরিকের জন্ম দেওয়াই ছিল চরম আদর্শ।

এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে তুলনা :—এথেন্স ও স্পার্টা প্রাচীন গ্রীসের এই দুটি উল্লেখযোগ্য নগর রাষ্ট্রের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, জাতীয়তা-বোধ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্য দেখা গেলেও অনেকগুলি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়।

রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে এথেন্স ছিল সাধারণতন্ত্র, যদিও স্বাধীন নাগরিক ছাড়া আর কেউ এ সমস্ত অধিকার ভোগ করতে পারত না।

সেই নাগরিকত্বও আবার কেবলমাত্র স্বাধীন নাগরিকের পুত্রই লাভ করত। স্পার্টায় কিন্তু প্রচলিত ছিল রাজতন্ত্র। সেই রাজতন্ত্র অবশ্য স্বৈরতন্ত্র ছিল না। রাজার ক্ষমতা ছিল নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রের মাতব্বর লোকদের সংসদ বা সমিতির পরামর্শ অনুসারে তাঁকে চলতে হ'ত।

এথেন্সের গৌরব ছিল এথেন্সবাসীদের চিন্তার ও শিক্ষার স্বাধীনতায়। রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ম নিগড়ে নাগরিকদের জীবন আবদ্ধ ছিল না। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক ও নাগরিক জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি রক্ষার প্রয়োজনে কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল। এথেন্সবাসীর নাগরিক জীবন ছিল মুক্ত ও স্বাধীন। অপরদিকে স্পার্টার মানুষের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিটি ব্যক্তির এবং সমাজের উপর কঠোর শৃঙ্খলার বন্ধন। প্রত্যেক নাগরিকের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের কঠোর বিধি নিষেধের শিকলে আবদ্ধ ছিল।

এথেন্সের শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব ছিল না। যার যে দিকে প্রতিভা সেইদিকে তার বিকাশ লাভের পূর্ণ সুযোগ ছিল। স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থা কিন্তু এথেন্সের বিপরীত ছিল। স্পার্টার শিক্ষা-ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ছিল। যুদ্ধকেই সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলে মনে করায় স্বাস্থ্যবান, সুদক্ষ, রণনিপুণ সৈনিক তৈরী করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ায় যুদ্ধ বিদ্যা ছাড়া আর কোন দিকেই এরা উন্নতি করতে পারেনি। অপরদিকে এথেন্সবাসীরাও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষাকে তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিল বটে, তবে স্পার্টার মত কঠোর শৃঙ্খলার বাঁধনে নাগরিক জীবনকে বদ্ধ করেনি। তাই ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকায় শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পার্টার থেকে অধিকতর উন্নত হয়ে উঠেছিল। এথেন্সের স্বাধীন মুক্ত আবহাওয়ায় তাই গ্রীক সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

এথেন্সের সমাজ জীবন ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। নাগরিকরা মুক্ত, স্বাধীন ও কর্মহীন জীবন যাপন করত। গল্প-গুজব ও আনন্দ-

স্ফূর্তির মাঝে তাদের জীবন কাটত। অপর দিকে স্পার্টার নাগরিক জীবনে ছিল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শৃঙ্খলার বাঁধন।

এথেন্স মানুষের প্রতিভার দাম দিত, কিন্তু স্পার্টা শুধু শৌর্য্য ও শক্তির মূল্য দিত। আজ স্পার্টাও নেই এথেন্সও নেই তবু স্পার্টার থেকে এথেন্স তার সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে আজও অমর হয়ে আছে। শুধু যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতাই কোন দেশের উৎকর্ষতার প্রমাণ নয়। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে যে দেশ যত সাহায্য করেছে সেই দেশই ইতিহাসে অধিক উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে।

সভ্যতার অগ্রগতিতে এথেন্সের অবদান

গ্রীসের যা কিছু সুন্দর ও মহান তা কিন্তু করেছিল এথেন্সবাসীরা। পারসিকদের আক্রমণে যখন এথেন্স বিব্রত তখন সেখানে সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির সময় ছিল না। পারসিকদের পরাজয়ের পর আসে পেরিক্লিসের যুগ। ধনে, সম্পদে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে এথেন্সের চরম উন্নতি হয়েছিল পেরিক্লিসের আমলে।

পেরিক্লিসের অবদান :—পেরিক্লিস ছিলেন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথেন্সবাসীরা একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন তাদের প্রতিপত্তি ভূমধ্য সাগরের পূর্ব-অঞ্চলের দ্বীপগুলি ও তার আশে পাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে এথেন্সে অনেক বড় বড় ভাস্কর, দার্শনিক, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন। তাই পেরিক্লিসের সময়কে এথেন্সের সুবর্ণ যুগ বলা হয়। পারসিক আক্রমণে এথেন্সের নগরের বহু ক্ষতি হয়েছিল, অনেক মন্দির প্রাসাদ ও অট্টালিকা ধ্বংস হয়েছিল।



পেরিক্লিস

পেরিক্লিস সেই ধ্বংস স্তূপের উপর অপরূপ একটি নূতন শহর গড়ে তুলেন। এথেন্সকে সুরক্ষিত করার পর, পেরিক্লিস একে শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যের অতুলনীয় করে গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর ছিলেন ফিডিয়াস। পেরিক্লিস ফিডিয়াসের উপর এই শহরের শোভা ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের ভার দেন। ফিডিয়াস অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এগুলির গঠনকৌশল ও কারু-কার্য্য দেখলে আজও অবাক হতে হয়। ফিডিয়াসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হল "পার্থিনন"—এটি এথেন্সের নগর দেবী এথেনার মন্দির। মন্দিরটি আগাগোড়া মার্বেল পাথরে তৈরী। ফিডিয়াস এথেনার দুটি মূর্ত্তি গড়ে-ছিলেন একটি সোনা ও হাতীর দাঁতের, অন্যটি ছিল ব্রোঞ্জের তৈরী। এটি এত বিশাল যে কোন মন্দিরে এর স্থান হয়নি। বিদেশ থেকে আসবার সময় এথেন্স-বাসীরা বন্দরে পৌঁছানোর অনেক আগেই সমুদ্র থেকে এই মূর্ত্তিটিকে দেখে শ্রদ্ধা জানাত। পার্থিননের পাশে ছিল সমুদ্র দেবতা পসিডনের ইরেকথিউম নামে এক অপূর্ব মন্দির। এথেন্সের আর একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ছিলেন প্রাক্সিটিলিস। তিনিও খুব সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি তৈরী করেন।

নাট্য সাহিত্য :—এথেন্সের নাট্য সাহিত্যেরও এইসময়ে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। পেরিক্লিসের সময়ে ডায়োনিসাসের নাট্যশালাটি নতুন করে নির্মিত হয়। সে সময়ে প্রত্যেক বছর প্রায় কুড়িখানা নতুন নাটকের অভিনয় হত। গ্রীক নাটকের দুটি শাখা-ট্রাজেডি অর্থাৎ মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে তৈরী নাটক, আর কমেডি বা প্রহসন। ট্রাজেডি রচনায় ঈস্‌কিলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিস এবং প্রহসন রচনায় এরিষ্টোফেনিস অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। ঈস্‌কিলাস স্যালামিসের যুদ্ধের বিষয় অবলম্বন করে একখানা নাটক রচনা করেছিলেন। এটির নাম "পার্সী"। কিন্তু তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলি গ্রীক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

সফোক্লিস :—এথেন্সের নাট্যকারদের মধ্যে সফোক্লিসের নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০ বছর বয়সেই নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এই বয়সেই তিনি এথেন্সের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সংগে প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি ১১৩ খানি নাটক লেখেন।

দর্শন :—পেরিক্লিসের যুগে গ্রীসে কয়েকজন মহাজ্ঞানী দার্শনিকের জন্ম হয়। এইসব মনীষীদের চেষ্টায় এথেন্সবাসীদের মধ্যে একটি যুক্তিবাদী মন গড়ে উঠে। যুক্তি ও বিচার করার ক্ষমতাবাড়ায় তাদের মন সংস্কারমুক্ত হয়।

সক্রেটিস :—পেরিক্লিসের আমলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিস। তিনি কোন বই লিখে যাননি। নিজে কোন বিশেষ মতবাদ প্রচার করতেও চাননি। তিনি এথেন্সের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন এবং সুযোগ পেলেই পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। প্রতিপক্ষের যুক্তির ত্রুটি দেখিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণ করতেন। তিনি অকাট্য যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা এথেন্সবাসীদের মনকে সংস্কার মুক্ত করতে চেষ্টা করেন।

এথেন্সবাসীরা কিন্তু এই স্বাধীন চিন্তানায়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত



বিষপানের পূর্বে সক্রেটিস আত্মপক্ষ সমর্থনে বলছেন

করেন। তাঁকে বিষপানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়।

সক্রেটিস বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে কথাগুলি বলেন আজও তা সারা জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন—"পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে মৃত্যুর ভয়ে আমাকে ভুলপথে চলিতে বাধ্য করিবে। আদর্শের পথ হইতে বিচ্যুত হইবার পরিবর্তে আমি এই মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

তাঁর শিষ্য ছিলেন প্লেটো। তাঁর রচিত "দি-রিপাবলিক" বইখানি অমূল্য গ্রন্থ। প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটল ন্যায়, মনোবিজ্ঞান, বীজগণিত ললিতকলা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস রচনা হয়েছিল এথেন্সে। এর আগে প্রামাণ্য ইতিহাস ছিল না। এ সময় ইতিহাস লিখে খ্যাতি লাভ করেন হেরোডটাস ও থুসিডিডিস।

হেরোডটাস ঃ—হোরাডটাসের জন্মস্থান এশিয়ামাইনরের হেলিকারনেসাস নগরে। ফিনিসিয়া, মিশর, ইরাণ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে প্রচলিত গল্প, শিলালিপি ও নানা বই থেকে তিনি ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহ করেন। পরে তিনি এথেন্সে বসবাস করেন এবং এখানেই তি ন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। এর আগে কেউ এমনভাবে ইতিহাস লেখেননি, তাই হেরোডটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। গ্রীক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা নিয়েই হেরোডটাস তাঁর ইতিহাস রচনা করে ছিলেন। থুসিডিডিস



হেরোডটাস

লেখেন পেলোপোনেসীয়ন্ (স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের) যুদ্ধের বিস্তৃত ইতিহাস। এই গ্রন্থে তিনি অসাধারণ নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।

ম্যাসিডন রাজ্য

গ্রীসের প্রধান দুটি রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধের ফলে এই দুটি রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। আর একটি রাজ্য এই সুযোগে শক্তি বৃদ্ধি করে চলে। এই রাজ্যটির নাম ম্যাসিডন। রাজা ফিলিপের নেতৃত্বে ম্যাসিডন রাজ্যটি বিশেষভাবে বেড়ে উঠেছিল। ফিলিপ নিজের চেষ্টায় গ্রীসের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্র করে একচ্ছত্র রাজা হোলেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এক সুদৃঢ় সৈন্যদল গড়ে তুলেন। ফিলিপ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পারস্য অভিযানের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। এমন সময়ে এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে তিনি প্রাণ হারালেন।

আলেকজাণ্ডার :—ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার রাজা হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে একটি মাত্র বিশাল সাম্রাজ্যের অধীনে আনবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। পারস্য সাম্রাজ্যের একতার অভাবে এবং আলেকজাণ্ডারের রণকৌশলে পারস্যের পরাজয় ঘটল। শীঘ্রই মিশরদেশ আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়ে গেল। এই-ভাবে সমগ্র পারস্যের উপর গ্রীক প্রভুত্ব স্থাপিত হল।


আলেকজাণ্ডার

ভারতবর্ষ আক্রমণ :—পারস্য জয়ের পর আলেকজাণ্ডার আফগানি-স্থান এবং পরে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে খাইবার গিরিপথের মধ্যদিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তারপর ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতের

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করেন। এই সময় ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোন একতা ছিল না বরং নিজেদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। আলেকজাণ্ডার এই সুযোগটি পুরোপুরিভাবে নিলেন। তিনি কাবুল উপত্যকার ভিতর দিয়ে এসে কাবুল ও সিন্ধুনদের মাঝখানে অবস্থিত পুষ্কলাবতী রাজ্যটি দখল করেন। পুষ্কলাবতীর রাষ্ট্রনায়ক অস্তি তাঁকে বাধা দিয়ে পরাজিত হন। এরপর তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। তক্ষশীলা থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে এসে আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর তীরে (ঝিলাম ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে) অবস্থিত পুরুর রাজ্যটি আক্রমণ করেন। রাজা পুরু বিপুল বিক্রমে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পুরু পরাজিত ও বন্দী হলেন। পুরুর বীরত্বে আলেকজাণ্ডার আগেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর তিনি বন্দী অবস্থাতেও তাঁর সাহসিকতা দেখে তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

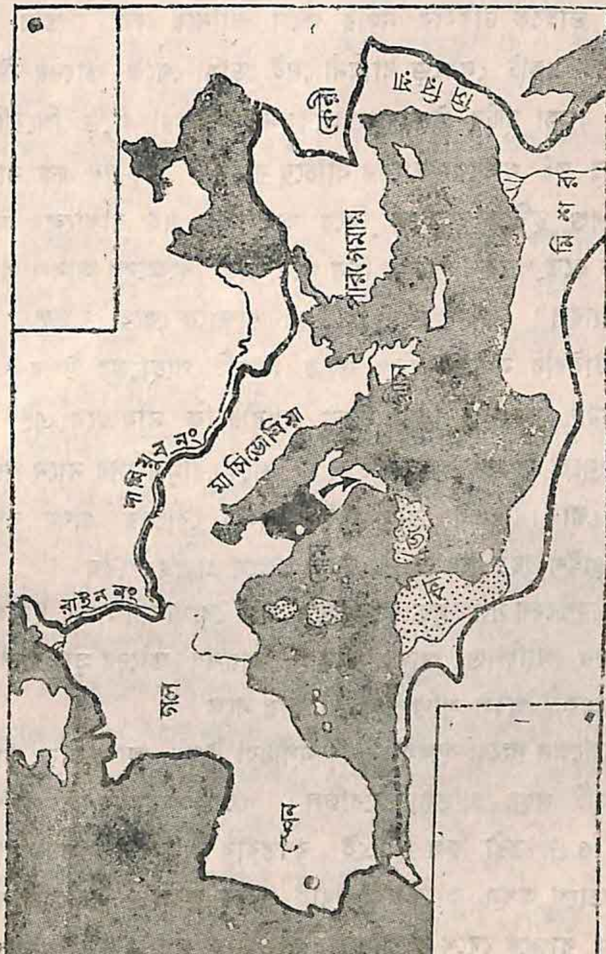
পুরুর কাছে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে এবং মগধের শক্তি ও সৈন্যদলের কথা শুনে আলেকজাণ্ডার বুঝলেন যত সহজে তিনি ভারতবর্ষ অধিকার করা যাবে মনে করেছিলেন তা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাঁর সৈন্যরাও বহুদিন দেশ ছেড়ে এসেছে এবং রণক্লান্ত তাই তারা আর অগ্রসর হতে রাজী হল না। সুতরাং আলেকজাণ্ডার ফিরে গেলেন, পথে ব্যাবিলন শহরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ৩২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল।

গ্রীসের পতন :—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। সেনাপতি সেলুকাসের ভাগে পড়ে পারস্য ও ভারতের অংশ। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ১৫০ বছরের মধ্যেই গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন হয়। কার্থেজ ধ্বংসের পর বিজয়ী রোম ম্যাসিডনিয়া ও গ্রীস অধিকার করে।

(৩)

রোম

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইটালী দেশের টাইবার নদীর তীরে একটি ছোট শহরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর নাম দেওয়া



হয়েছিল রোম। সেখানে যারা বাস করত তারাও স্পার্টানদের মত বীর ছিল, আর এথেন্সের লোকেদের মত লেখাপড়া ও শিল্পের কাজ

ভালবাসত। সভ্য জাতি হিসাবে সে যুগে এরাও খুব উন্নতি করেছিল।

রোমের প্রতিষ্ঠা :—রোম শহরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এক রাজকুমারীর **রোমুলাস** আর **রিমাস** নামে দুটি যমজ ছেলে হয়। এদের মেরে ফেলবার জন্য এক দুষ্টু রাজা ডোঙায় করে দু' ভাইকে টাইবার নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। তারা কিন্তু মরল না। একটি নেকড়ে বাঘিনী সেই ডোঙা থেকে তাদের উদ্ধার করল। বাচ্ছা দুটির উপর তার কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল। সে নিজের দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। একদিন এক রাখাল লুকিয়ে শিশু দুটিকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। সেই রাখালের ঘরেই তারা বড় হতে থাকে। অনেক দিন পরে তারা নিজেদের আসল পরিচয় জানতে পারল। তখন তারা সেই দুষ্টু রাজাকে মেরে ফেলল। এই দু'ভাই টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে সাতটি পাহাড়ের উপর একটি নগরী নির্মাণ করল। কিন্তু নূতন নগরীর কি নাম হবে এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হ'ল। শেষে রোমুলাসের নামে শহরের নাম হল রোম। এই রোমুলাসই ছিলেন রোমের প্রথম রাজা। প্রায় আড়াইশ বছর ধরে বিভিন্ন রাজা রোমে রাজত্ব করেন।

প্রতিবেশীদের সংগে যুদ্ধ করে ক্রমে ক্রমে রোমানরা সমগ্র ইটালীতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করে। তারপর তাদের যুদ্ধ শুরু হ'ল বাইরের একটি প্রবল শক্তিশালী রাজ্যের সঙ্গে।

কার্থেজের সংগে সংঘর্ষ :—ফিনিসীয়রা উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। এদের অনেকগুলি বাণিজ্য-জাহাজ ও রণতরী ছিল। এই রণতরীর শক্তিতেই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম ভাগে তখন কার্থেজবাসীরাই কর্তৃত্ব করত। রোমের ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে দেখে কার্থেজবাসীরা আর সহ্য করতে পারল না, শেষে তাদের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। এই যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ।

রোমানদের সংগে কার্থেজের তিনটি বড় বড় যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম

যুদ্ধে কার্থেজবাসীরা হেরে গেল এবং অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সিসিলিতে সকল দাবী ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এরপর বেশ কিছুদিন শান্তিতে কেটে গেল কিন্তু হ্যামিলকার বার্কা নামে কার্থেজের এক সেনাপতি স্পেন জয় করে সেখান থেকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। স্পেনে যাবার সময় তিনি সংগে নিয়ে গেলেন তাঁর ন' বছরের ছেলে হ্যানিবলকে। যাবার সময় দেব মন্দিরের বেদী স্পর্শ করিয়ে ছেলেকে প্রতিজ্ঞা করালেন যে সে জীবন থাকতে রোমের সংগে মিত্রতা করবে না। তেইশ বছর পরে দ্বিতীয়বার রোমের সংগে যুদ্ধ শুরু হ'ল। পিতার মৃত্যুর পর হ্যানিবলই তখন কার্থেজের সেনাপতি।

হ্যানিবল ঃ—রোমান সৈন্যরা স্পেন আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তার আগেই হ্যানিবল ইটালী আক্রমণ করলেন। জলযুদ্ধে রোমানরা ছিল বেশী শক্তিশালী তাই হ্যানিবল স্থলপথে আল্পস পর্বত পার হয়ে ইটালীতে গেলেন।

ক্রমাগত পনের বছর ধরে যুদ্ধ করে হ্যানিবল ইটালীর প্রায় সমস্তটা জয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রোম অধিকার করতে পারলেন না। রোমান সেনাপতি ফেবিয়াস অতর্কিতে আক্রমণ করে ও রসদ লুঠ করে কার্থেজবাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কেনির যুদ্ধে সত্তর হাজার রোমান সৈন্য নিহত হল। কিন্তু হ্যানিবলের ভাই হ্যাসড্রুবল রোমান সেনাপতি সিপিওর অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত ও নিহত হলেন। হ্যানিবল যুদ্ধে না হেরেও ইটালী ছেড়ে গেলেন। সেনাপতি সিপিও স্পেন জয় করে কার্থেজ আক্রমণ করলেন। ষোল বছর যুদ্ধের পর জামার যুদ্ধে কার্থেজের চরম পরাজয় হল। ভূমধ্য সাগরের তীরে রোমের আর প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

জামার যুদ্ধের পর হ্যানিবল স্বদেশ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং আত্মহত্যা করলেন।

স্বাধীনতা হারাবার পরও কার্থেজের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়নি। তাই দেখে রোমানরা ঈর্ষায় জ্বলে মরত। কেটো নামক একজন রোমান

নেতার ইচ্ছায় শেষে তুচ্ছ কারণে রোমানরা কার্থেজ ধ্বংস করল।

রোমের সমাজ ঃ—রোমের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ছিল। সবচেয়ে বেশী সুবিধা ও সম্মান ভোগ করত রাজ-কর্মচারীরা। রোমে সৈনিকদের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায় আর তাদের জীবন যাত্রাও ছিল উন্নত।

রোমের সমাজ প্রথমের দিকে ছিল কৃষকের সমাজ। রোমের নাগরিকরা যখন বিদেশে যুদ্ধ করতে যেত তখন ক্ষেত খামারের কাজের খুব ক্ষতি হত। সে যুগে রোমে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। সূতী ও রেশমের কাপড়, হাতীর দাঁতের ও কাঠের জিনিষ, মসলা, চিনি এবং সুগন্ধি দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানী হত। রোমের নাগরিকদের খাওয়া পরার কোন অভাব ছিল না। আমোদ-প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। নাগরিকদের থিয়েটার সার্কাস এবং কলোসিয়ামের লড়াই দেখান হত।

রোমের শাসনতন্ত্র (অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণী) ঃ—রোমের রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে নেন। তাদের একটি সভা ছিল এর নাম সেনেট। এথেন্সের মত রোমের প্রত্যেক নাগরিকের কিন্তু শাসন সম্বন্ধে কথা বলার অধিকার ছিল না, সে অধিকার ছিল অভিজাত শ্রেণীর। এই শ্রেণীকে বলা হত প্যাট্রিশ্‌নস্‌ (Patricians) বা অধিকারভোগী সম্প্রদায়। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক বছর দু'জন কন্‌সাল নির্বাচিত হতেন। কন্‌সালরা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন না। নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত কন্‌সালের ও সেনেটের মনোনীত প্রার্থীতালিকার মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হ'ত। বিরোধী পক্ষের কোন প্রার্থী সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হলেও ভারপ্রাপ্ত কন্‌সাল তাঁকে স্বীকৃতি নাও দিতে পারতেন। সাধারণতন্ত্রের শুরুতে পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারতেন। আর কন্‌সালদের পরামর্শ দেবার জন্যই ছিল সেনেট। যারা গরীব এবং অনভিজাত তাঁদের বলা হত প্লিবিঅ্যানস্‌ (Plebeians)। এই অনভিজাত গরীব শ্রেণী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করে। ফলে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি

নতুন পদের সৃষ্টি হয়। অনভিজাতদের প্রতি যাতে অন্যায় না হয় তা দেখতেন ট্রিবিউন (Tribune) নামে একজন প্রতিনিধি।

নাগরিকত্ব ঃ—প্রত্যেক রোমানই রোমে সাম্রাজ্যের নাগরিকত্ব লাভ করত। তাদের ছেলে মেয়েরাও জন্ম সূত্রে নাগরিক হত। রোমের নাগরিকরা নামেই নাগরিক ছিল। সাধারণ মানুষ শাসনতন্ত্রের বিশেষ কিছুই বুঝত না। আনন্দ, স্ফূর্তি ও মজা করে জীবন কাটাত। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোন বোধ ছিল না। অভিজাত শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত সেনেটের শাসনকে গড্ডালিকা প্রবাহের মত কোন নেতার নির্দেশে কখনও সমর্থন জানাত আবার কখনও সমালোচনা করত। বিভিন্ন বিজিত দেশ থেকে যেসব ক্রীতদাসদের বন্দী করে আনা হত তারা রোমের নাগরিকত্ব পেত না। কোন সুযোগ সুবিধা পেত না। দাস হিসাবেই সমস্ত পরিশ্রমের কাজ করত।

ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঃ—রোমানরা যে সব দেশ জয় করত সেখান



রোমানদের ক্রীতদাস নির্যাতন

থেকে সেই দেশের অধিবাসীদের বন্দী করে আনত। প্রধানতঃ বিজিত মানুষদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল ক্রীতদাস শ্রেণী। এই ক্রীতদাস শ্রেণীর মধ্যে ছিল বিভিন্ন দেশের মানুষ। এরা অনেকেই ছিল শক্তিমান বীর যোদ্ধা, গুণী, পণ্ডিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তি। ক্রীতদাস অবস্থায় রোমানরা এদের

পশুর মত জীবন-যাপন করতে বাধ্য করত। রোমের অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী ক্রীতদাসদের খুব কম দামে কিনে নিত; তারপর তাদের দিয়ে চাষ-আবাদ ও বাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম করাত। সে সময়ে ক্রীতদাসরাই রোমের সব কাজকর্ম করত। তাদের দিয়ে বড় বড় বাড়ী ও রাস্তাঘাট তৈরী, খনির কাজ এবং জাহাজের দাঁড় টানান হত। কাজে কোনরকম ত্রুটি দেখলেই পশুর মত নির্যাতন করা হত। এমন কি রোমানরা আনন্দ উপভোগ করার জন্যে খালি হাতে ক্রীতদাসদের জন্তুজানোয়ারের খাঁচার মধ্যে ফেলে দিয়ে মানুষ ও হিংস্র জন্তুর মধ্যে লড়াই দেখত। যতক্ষণ না এক পক্ষের প্রাণ যায় ততক্ষণ এই লড়াই চলত।

অসহায় ক্রীতদাসরা রোমানদের এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গুমরে মরত কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস কারও ছিল না। সে যুগে রোমের নাগরিকদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে বন্দী ক্রীতদাসদের নিয়ে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করা হ'ত। হিংস্র পশুর সঙ্গেও এদের যুদ্ধ করতে হ'ত। ফলে অনেকেই মারা যেত। মল্লযুদ্ধ শিক্ষাদানের জন্যে রোমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল। এই রকম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কাপুয়া নামক স্থানে। এখানের একজন সাহসী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ক্রীতদাস ও মল্লযোদ্ধা ছিল স্পার্টাকাস। স্পার্টাকাস এই নিপিড়ীত ক্রীতদাসদের মনে ফিরিয়ে আনল আত্মবিশ্বাস ও সাহস। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ৭৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ক্রীতদাসদের বিক্ষোভ ফেটে পড়ল বিদ্রোহরূপে। দু' বছর স্পার্টাকাস দক্ষিণ ইটালীতে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখেন। ৭২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রোমের দুজন প্রেটর ও কন্সালকে পরাজিত করেন। কিন্তু ৭১ খৃষ্ট পূর্বাব্দে লিসিনিয়াস ক্রাসাসের নিকট স্পার্টাকাস নিহত হন। ভগবানদত্ত অধিকার থেকে আর একবার নিপিড়ীত মানুষ হ'ল বঞ্চিত।

জুলিয়াস সীজার

কার্থেজ ধ্বংসের পর বিজয়ী রোম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের অনেক দেশ জয় করে। এই বিরাট ভূখণ্ডের উপর রোমের

প্রভুত্ব স্থাপনের সাথে সাথে রোমের শাসন ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়। আগে রোমের নাগরিকেরা সিনেটের (সভা) মধ্য দিয়ে শাসনকার্য্য চালাত। কালক্রমে সিনেটের দলাদলি ও দুর্নীতিতে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট খুব বেড়ে গেল। দেশের সম্পদ অল্প লোকের হাতে জমা হতে লাগল। টাকার জোরে বড় বড় মানুষেরা শাসন তন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগল।

সাধারণ তন্ত্রের অবসান :—ক্রমে সাধারণ লোক বুঝতে পারল সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তন না হলে এইসব অন্যায়ের প্রতিকার হবে না। সংকটের সময় রোমে ডিক্টেটর বা একনায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে একজন শক্তিশালী এক-নায়কের ; এই ভাবে রোমে একনায়ক শাসনের সৃষ্টি হল। এই সমস্ত এক নায়কের মধ্যে জুলিয়াস সীজারের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে যোদ্ধা ও সাহিত্যিক। তাঁর বীরত্বেই বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও বৃটেনের কিয়দংশ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে শাসন সংস্কারে মন দেন। সীজারের শাসনে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তিনি অনেক জনহিতকর কাজও করেন। তিনি রাজদণ্ডও ব্যবহার করতে শুরু করেন। অনেকে মনে করল তিনি রাজা হবার চেষ্টা করছেন। রোমানদের একদল লোক রাজপদকে ঘৃণা করত। তারা ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্য্যন্ত জুলিয়াসকে হত্যা করল।



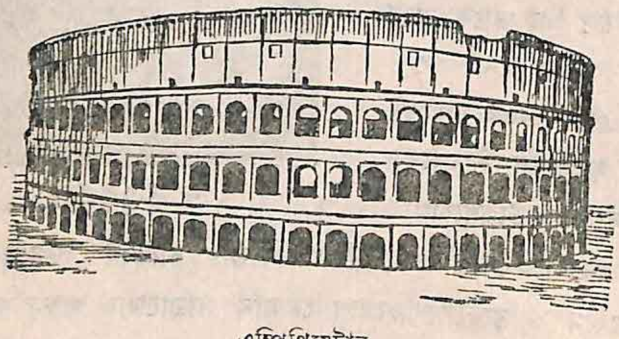
জুলিয়াস সীজার

নূতন সাম্রাজ্য :—আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অক্টোভিয়ান নামে

সীজারের এক নিকট আত্মীয় সমস্ত বিপক্ষ দলকে পরাজিত করে সীজারের মত সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। রোমের সিনেট তাঁকে **অগাষ্টাস** অর্থাৎ **"মহামহিমান্বিত"** উপাধি দেয় এবং সেই সময় থেকে রোমে সম্রাট-দের যুগ আরম্ভ হয়। অক্টোভিয়ান অগাষ্টাস রোমের প্রথম সম্রাট হন।

অগাষ্টাসের সময়ে রোমে শিল্প ও সাহিত্যে এমন উন্নতি হয়েছিল যে রোমের ইতিহাসে অক্টোভিয়ান যুগ সুবর্ণ যুগ বলে বিখ্যাত। রোমে বিভিন্ন সম্রাট রাজত্ব করেন তার মধ্যে রোমে সম্রাট ক্যালিগুলা ছিলেন ভয়ানক নিষ্ঠুর। নীরো নামে আর একজন সম্রাট ছিলেন খুব খামখেয়ালী ধরণের। সম্রাটদের মধ্যে মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন সাধু চরিত্র ও দার্শনিক।

সাম্রাজ্যের যুগে রোমের অগ্রগতি, উত্থান এবং পতন :—সম্রাটেরা সকলেই খুব জাঁক-জমক ভাল বাসতেন। তাঁদের আদেশে রোমে সুন্দর সুন্দর শ্বেত-পাথরের দালান, কোঠা, বিজয়স্তম্ভ, তোরণ, বড় বড় স্নানাগার, "ফোরাম" "এম্পিথিয়েটার," ইত্যাদি তৈরী হয়েছিল।



এম্পিথিয়েটার

ফোরামে লোকেরা সভাসমিতি ও অন্যান্য কাজ কর্মের জন্য জমা হত। এম্পিথিয়েটারে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখান হত। এই এম্পিথিয়েটারটি "কলোসিয়াম" নামে পরিচিত। এখানকার প্রতিযোগী যোদ্ধাদের বলা হত "গ্লাডিয়েটার"। সারা সাম্রাজ্যে রোমের অনুকরণে বিভিন্ন শহর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ধনসম্পদে ও সৌন্দর্যে রোমই ছিল সবচেয়ে সেরা।

রোমান সম্রাটরা দেশরক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। সুশাসনের জন্য তাঁরা অনেক আইন-কানুনও প্রচলন করেন। তাঁরা খাল কেটে জল সেচের ব্যবস্থা করেন। বড় বড় শহরে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালেরও ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীর অগ্রগতির ইতিহাসে রোম সভ্যতার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোম-সাম্রাজ্য সংগঠনে রোমের সম্রাটগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সম্রাটদের রাজত্বকালে রোমে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কবি ভার্জিল ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ভার্জিল হোমারের মত একখানি মহাকাব্য রচনা করেন তার নাম হল "ইনিড"। রোমের ঐতিহাসিকদের মধ্যে লিভি ও ট্যাসিটাস সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

সাম্রাজ্যের বিশালতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষমতালিপ্সা, বিশেষতঃ পীত ও হূণ নামে বর্বর জাতির ক্রমাগত আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

খৃষ্টধর্ম

রোমানরা এশিয়ার অনেক দেশ জয় করেছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত জুডিয়া ছিল এই দেশগুলির একটি। জুডিয়ায় বাস করত ইহুদি জাতির লোকেরা। রোমান সম্রাট অগাষ্টাসের সময়ে যীশুখৃষ্ট জন্মান। ইনিই খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক। যীশুর মায়ের নাম মেরী এবং বাবার নান যোসেফ। জেরুজালেমের বেথ্‌লেহেম নগরে একটি সরাইখানায় ঘোড়ার খাবার পাত্রের মধ্যে যীশুর জন্ম হয়।

যীশু গরীবের ছেলে ছিলেন, তাই তাঁর ভাগ্যে লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। বাল্যকাল থেকে তিনি ঈশ্বরের এবং প্রকৃত ধর্মের কথা ভাবতেন। তাঁর জ্ঞাতি ভাই জন্ তাঁকে জর্ডন নদীর জলে স্নান করিয়ে ব্যাপটাইজ বা পবিত্র করেন।

যীশু মানুষের মধ্যে শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করেন। সহস্র

সহস্র মানুষ তাঁর এই মহান শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল। সমাজের অভিজাত শ্রেণী তাদের কর্তৃঃ চলে যাচ্ছে মনে করে যীশুর উপর অসন্তুষ্ট হল। যাজকের দল যীশুকে রোম শাসনের বিরোধী বলে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করল। বিচারে ক্রুশবিদ্ধ করে যীশুকে হত্যা করা হল।



ক্রুশবিদ্ধ যীশু

পৃথিবীর সকল মানুষকে ভালবাসবার মহানবাণী যীশু প্রচার করেন। যীশুর মৃত্যুর পর খৃষ্টান ধর্ম বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়। এখন ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র খৃষ্টধর্ম গৃহীত হয়েছে। রোমান সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান খৃষ্টান ধর্মের বিরোধী ছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র খৃষ্টানকে হত্যা করেন। রোম সাম্রট কনস্ট্যানটাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর খৃষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রসার লাভ করে।

(৪)

চীন

সাং রাজবংশ ঃ—আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে চীনে সাং বলে একটি রাজবংশ রাজত্ব করত। এই সময় থেকেই চীনে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়। সাং রাজবংশের রাজধানীর ধ্বংস স্তূপ ইনের ঢিবি খুঁজে সে যুগের জীবন যাত্রার অনেক বিবরণ জানা গেছে। এই ধংস স্তূপ থেকে বের হয়েছে কচ্ছপের খোলে খোদাই করা বিচিত্র লিপিমালা। সে যুগে চীনারা হাড়ের উপর ও কচ্ছপের খোলের

উপর দাগ কেটে লিখত ও ছবি আঁকত। এই সব ছবি দেখে সে সময়ের অনেক কথা জানা যায়। সাং যুগে জ্যোতিষিরা কচ্ছপের খোলার সাহায্যে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করত। কচ্ছপের খোলার একদিক পুড়িয়ে খানিকটা গর্ত করে ফেললে অপর দিকে যে ফাটল ধরত তার গতি দেখে দৈবজ্ঞরা ভবিষ্যতের কথা বলত। প্রশ্ন ও দৈবজ্ঞের উত্তর লেখা কাছিমের খোল থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় প্রায় দু হাজার শব্দ চিত্র প্রচলিত ছিল। সেকালে বেশীর ভাগ লোক কৃষিজীবি ছিল। তারা ধান, গম ও জোয়ারের চাষ করত। কিন্তু লাঙ্গলের ব্যবহার জানত না। সাং যুগে চীনারা সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ ও পিতলের নানা জিনিষপত্র তৈরী করতে পারত এবং এগুলির উপর নানা রকম চিত্র ও মীনের কাজ করত। তারা রেশমের সুতো থেকে কাপড় বুনত শন এবং অন্যান্য তন্তু থেকেও কাপড় বোনার কৌশল সাং যুগে চীনের তাঁতীরা শিখেছিল। চীনাদের কাঠি দিয়ে ভাত খাওয়ার পদ্ধতিও সাং বংশের সময়েই চালু হয়।

চীনের মহাপ্রাচীর ঃ—সাং রাজ বংশের রাজত্বকালে চীনে স্থাপত্য



চীনের প্রাচীর

শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই যুগেই চীনের মহাপ্রাচীর নির্মিত হয়।

শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে এই বিশাল প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিল। এটি এত চওড়া যে এর উপর দিয়ে অশ্বারোহীরা অনায়াসে ছুটে যেতে পারত। মিশরের পিরামিডের মত, চীনের প্রাচীরও বিশালত্বের দিক দিয়ে বিস্ময়ের বস্তু।

চৌ-বংশ :—সাং-বংশের পর চৌ-বংশের রাজারা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই বংশের উ-নামে একজন রাজা চীনের অভিজাতগণকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেন। প্রত্যেক অভিজাত লোককে কিছু জমি দেওয়া হত। এই সব জমির প্রজারা জমিদারের শাসন মেনে চলত; এবং তাঁর ব্যবহারের জন্যে মাছ, মাংস, কাঠ, চামড়ার পোষাক ইত্যাদি যোগান দিত। কুড়ি বছর বয়স হলেই প্রত্যেক প্রজা চাষের জন্য এক ফালি জমি পেত। ষাট বছর বয়স পর্য্যন্ত তারা সেই জমি চাষ করত। এর পরও যদি কেউ বেঁচে থাকত তবে তার ভরণ-পোষণের জন্যে তাকে বৃত্তি দেওয়া হত। চৌ-রাজ-বংশের রাজত্বের শেষের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশের সঙ্গে চীনের সংযোগ শুরু হয়।

চৌ-রাজবংশের রাজত্ব কালেই চীন দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কন্‌ফুসিয়াস জন্মে ছিলেন।

কন্‌ফুসিয়াস :—খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই মানুষের মনে এক আলোড়ন এনেছিল। পুরোহিত সম্প্রদায়ের অত্যাচারে যখন সাধারণ মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছিল, মানুষকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখানোর জন্যে সে সময়ে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব, গ্রীসে যুক্তিবাদী চিন্তানায়কেরা এবং চীন দেশে কন্‌ফুসিয়াস জন্মান। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে কন্‌ফুসিয়াসের জন্ম হয়। ইনি প্রাচীন সাং-রাজবংশের সন্তান। বর্তমান সাং টুংএর অন্তর্গত লু-নামক একটি ছোট্ট রাজ্যের তিনি অধিবাসী ছিলেন। তিন বৎসর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। অভাবের সংসারে মা ও ছেলের কোন রকমে দিন কাটে। ছেলে-বেলায় লেখাপড়া করার সুযোগ তাঁর হয়নি। কিন্তু নানা জায়গায়

কাজ করার সময় তিনি ধনুর্বিদ্যা ও সঙ্গীত শিখে ছিলেন। তিনি দেখতে খুব কুৎসিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল পবিত্র ও সুন্দর।

এই সময়ে চীন দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। চৌ-রাজবংশের রাজারা তখন চীনে রাজত্ব করছেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেশের জমিদাররা বিদ্রোহ করল। আর রাজ্যের নানা জায়গায় নিজেরাই রাজা হয়ে বসল। উত্তর দিক থেকে অসভ্য জাতির লোকেরা মাঝে মাঝে চীনে হানা দিতে লাগল। এই অরাজকতার মধ্যে সাধারণ লোকের দুঃখ কষ্টের আর সীমা রইল না।


কন্‌ফুসিয়াস

দেশের দুরবস্থা কিভাবে দূর করা যায়, কন্‌ফুসিয়াস সর্বদা সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিহাস পড়ে প্রাচীন রীতি-নীতির ওপর তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি বুঝলেন নৈতিক অধঃপতনই জনগণের দুঃখ কষ্টের কারণ। মানুষ যদি চরিত্রবান হয়, তার মন যদি সুন্দর হয় তবেই সমাজে শান্তি থাকতে পারে।

নৈতিক শিক্ষা প্রচারের জন্য কন্‌ফুসিয়াস শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন। এরজন্যে তিনি কোন মাহিনা নিতেন না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ছাত্ররা যেমন গুরুর বাড়ীতে থেকে লেখা পড়া করত কন্‌ফুসিয়াসের ছাত্ররাও তাঁর বাড়ীতে থাকত। অল্পসময়ের মধ্যেই কন্‌ফুসিয়াসের গভীর জ্ঞানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে এক জমিদার তাঁকে একটি শহরের শাসনকর্তা করে দিলেন। যাতে লোকে সৎ ও মহৎ জীবন যাপন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে সেই শহরের অধিবাসীদের জন্যে তিনি কতকগুলি আইন

করলেন। দেখা গেল সেগুলি মেনে সেই শহরের বাসিন্দারা খুব উন্নত হল। এরপর তিনি শিষ্যদের নিয়ে বার বছর ধরে চীনের নানা জায়গায় ঘুরে তাঁর উপদেশগুলি প্রচার করেন।

কন্‌ফুসিয়াসের শিক্ষা—কন্‌ফুসিয়াস বলতেন সংসার ত্যাগ করার কোন দরকার নেই। সংসারে বাস করেই সমাজকে উন্নত করতে হবে। প্রাচীন কাল থেকে যে রীতি-নীতি চলে আসছে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পিতামাতা ও গুরুজনদের ভক্তি করতে হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে। দেশের রাজাকে প্রজারা যেমন পিতার মত শ্রদ্ধা করবে, রাজাও তেমন প্রজাকে সন্তানের মত পালন করবে। মোটের ওপর ভাল নাগরিক হতে হলে এবং জনসাধারণের সেবা করতে হলে যে সব গুণ থাকা দরকার, তিনি সবাইকে তা শেখাতেন।

খৃষ্টপূর্ব ৪৭৮ অব্দে কন্‌ফুসিয়াস মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর চীনের লোকেরা তাঁর উপদেশগুলি মেনে নিয়েছিল, আর দীর্ঘ দিন এইগুলিই ছিল তাদের আদর্শ।

(৫)

ভারতবর্ষ

(ক)

ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় এবং সিন্ধু সভ্যতা যখন পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই সময় মধ্য-এশিয়া এবং মধ্য-পূর্ব ইউরোপের এক যাযাবর মানুষের দল ক্রমে সভ্য হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন সভ্য জগৎ এদের অস্তিত্বকে তখন বিশেষ মূল্য দেয়নি। ক্রমে ক্রমে এরা বিভিন্ন দিক থেকে প্রাচীন দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু করে। এই যুদ্ধ অনেকদিন পর্য্যন্ত চলতে থাকে, শেষে এই যাযাবর জাতিই প্রাচীন সভ্য দেশগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই জাতির লোকেরা এক বিচিত্র ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত।

পণ্ডিতদের ধারণা এই আদিম ভাষা থেকেই সংস্কৃত, ইরাণী, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে। এই ভাষায় যারা কথা বলত ইতিহাসে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে আর্য্য। সিন্ধু-সভ্যতার পরবর্ত্তী যুগে এই জাতি ভারতে বসতি স্থাপন ও আধিপত্য বিস্তার করে।

আর্য্যদের আগমনঃ—আর্য্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল আজ পর্য্যন্ত সঠিক জানা যায়নি, আর তারা যে কোন্ সময়ে ভারতে এসেছিল এ সম্বন্ধে স্থির নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায়নি। অনেক ঐতিহাসিকদের মত যে ভারতবর্ষেই আর্য্যদের আদি বাসস্থান। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সরস্বতী নদীর তীরে এদের আদি বাসস্থান ছিল। আবার আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকরা মনে করেন আর্য্যরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিল ; দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ছিল তাদের আদি বাসভূমি। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আর্য্যগণ মধ্য এশিয়ায় কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করত। খাদ্যাভাব, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, দলীয়সংঘর্ষ ও স্থানাভাব ইত্যাদির জন্য তারা আদি বাসভূমি ছেড়ে নানাদিকে চলে যায়। খৃষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে এদের একটি দল হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ অন্যান্য শাখা ইরাণ, গ্রীস ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজির হয়।

বসতি স্থাপনঃ—ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আর্য্যরা প্রথমে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এখানে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই অনার্যাদের যুদ্ধ চলেছিল। আর্য্যরা যেমন ছিলেন বলিষ্ঠ, সুপুরুষ, তেমনই ছিলেন যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী। আর তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অনার্য্যদের থেকে উন্নত ধরণের তাই আর্য্যরা যুদ্ধে জয়ী হয়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে অনার্য্যরা বিন্ধপর্বতের দক্ষিণে আশ্রয় নেয়। যারা আর্য্য অধিকৃত অঞ্চলে রয়ে যায় তাদের সংগে আর্য্যদের মেলামেশার ফলে আর্য্য ও অনার্য্যদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের মধ্যে মিলন

ঘটে এবং একটি মিশ্র জাতির জন্ম হয়। এই মিশ্র সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার মূল কাঠামো। আর্য্যরা সিন্ধু শব্দের "স" উচ্চারণ করতে পারত না। তারা "স" কে "হ" উচ্চারণ করত। তা থেকেই ভারতীয় আর্য্যগণ পরবর্ত্তীকালে হিন্দু নামে পরিচিত হয়। ক্রমে আর্য্যরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চল অধিকার করে। সপ্তসিন্ধু বলতে মোটামুটি ভাবে কাবুল থেকে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বুঝাত। এই অঞ্চলে বিপাশা, শতদ্রু, ইরাবতী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, সিন্ধু ও সরস্বতী এই সাতটি নদী প্রবাহিত হত বলেই এই অঞ্চলকে সপ্তসিন্ধু বলা হত। এর কিছুদিন পরে আর্য্যরা ভারতের আরও ভিতরে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। তারপর বঙ্গদেশ থেকে কামরূপ (আসাম) পর্য্যন্ত তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত এবং পূর্বে কামরূপ ও বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ড আর্য্যদের অধিকারে আসে। আর্য্যদের বাসভূমি বলে এই অঞ্চলের নাম হয় আর্য্যাবর্ত।

আর্য্যরা ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের চেয়ে অনেক সুসভ্য ছিল একথা বলা ঠিক হবে না তবে তাদের সভ্যতায় চিন্তা ও মনন শীলতার বেশী মূল্য ছিল, আর সমাজ ব্যবস্থাও উন্নত ছিল। আর্য্যদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে তাদের তখনকার জীবনের নানা কথা জানা যায়। বেদই আর্য্যদের সম্বন্ধে জানার একমাত্র উপায় বলে এই সভ্যতাকে বলে বৈদিক সভ্যতা।

(খ)

বেদ

আর্য্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। "বিদ" কথাটির মানে "জ্ঞান", এই শব্দটি থেকেই "বেদ" নামের উৎপত্তি হয়েছে। হিন্দুরা মনে করেন "বেদ" "ভগবানের বাণী," যা আর্য্যরা শুনেছিল। তাছাড়া বহুদিন পর্য্যন্ত বেদ লেখা হয়নি ; মুখে মুখে শুনে শেখা হত। সেই জন্য বেদের নাম "শ্রুতি"। বেদের চারটি ভাগ ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব।

প্রতিটি বেদ আবার দু-ভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণ ও সংহিতা। ব্রাহ্মণ ভাগের আবার দু'টি অংশ আরণ্যক ও উপনিষদ। চারটি বেদের মধ্যে ঋক্ সবচেয়ে পুরাতন। এতে মোট এক হাজারের বেশী স্তব আছে। দেবদেবীর পূজার মন্ত্র ও স্তব গান এর প্রধান বিষয় বস্তু। সামবেদের স্তোত্রগুলি যাগযজ্ঞের সময় গানের সুরে গাওয়া হত। তাই সামবেদ সাম গান বলেও পরিচিত। আর্য্যরা যে সমস্ত যাগযজ্ঞ করত তার ক্রিয়াকলাপের মন্ত্র যজুর্বেদে আছে। সর্বশেষ বেদ অথর্ব বেদ, এতে সৃষ্টিরহস্য, চিকিৎসাবিদ্যা, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আছে।

বেদকে শুদ্ধভাবে পড়বার জন্য এবং আচার অনুষ্ঠান সঠিক ভাবে পালন করার জন্য পরবর্ত্তীকালে ছ'টি 'বেদাঙ্গ' রচিত হয়; এগুলি হ'ল শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প। আর রচিত হয় ছ'টি দর্শন যেগুলি হল—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা।

বেদকেই আর্য্যরা জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক বলে মনে করতেন। আর্য্য জীবনের নিত্য কর্মের সঙ্গে ছিল বেদের নিবিড় সংযোগ। বেদ থেকেই আর্য্য সভ্যতার সমস্ত বিবরণ জানা যায়।

(গ)

আর্য্যদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন

সামাজিক জীবন :—আর্য্য সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন পরিবারের কর্তা। একই বংশের অনেকগুলি পরিবার নিয়ে এক একটি গোত্র এবং কতকগুলি গোত্র নিয়ে এক একটি জাতি গড়ে উঠত। আর্য্য সমাজের ভিত্তি ছিল গ্রাম। সভা ও সমিতি নামে জনসাধারণের দু'টি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মত রাজাকে চলতে হত। প্রথমে জাতি ভেদ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ক্রমে যাঁরা ধর্ম-কর্ম ও লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। যাঁরা রাজ্য রক্ষা, রাজ্য শাসন ইত্যাদি করতেন তাঁরা হলেন ক্ষত্রিয়। যাঁরা চাষবাস, শিল্প কাজ ও ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে থাকতেন তাঁরা বৈশ্য নামে পরিচিত হলেন।

অনার্য্যদের মধ্যে যারা ঐ তিন শ্রেণীর সেবা করত তাদের বলা হত শূদ্র।

আর্য্য সমাজে স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ ছিল। আপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি নারীরা খুব শিক্ষিতা ছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদ সাধারণতঃ সুতা ও পশম দিয়ে তৈরী হত। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই গহনা পরতেন। আমিষ ও নিরামিষ সব রকম খাদ্যই এঁরা খেতেন। উৎসব অনুষ্ঠানে এঁরা সোমরস পান করতেন। আমোদ প্রমোদের মধ্যে ছিল পাশা খেলা, শিকার, নাচ-গান ইত্যাদি।

আর্য্যদের জীবন চারটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। আর্য্য বালক যখন গুরুর কাছে লেখাপড়া করত তাকে বলা হত **ব্রহ্মচর্য**। পড়াশুনার পর যখন সংসার করত, সেই সময়কে বলা হত **গার্হস্থ্য আশ্রম**। তারপর যখন বুড়ো হতেন তখন সংসার ছেড়ে ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকতেন এই সময়কে বলা হত **বানপ্রস্থ**। আর সংসারের মায়া কাটিয়ে এরপর যখন বনে গিয়ে তপস্যা করতেন তখন তাকে বলা হত **সন্ন্যাস**। জীবনের এই চারটি ভাগকে বলা হত **চতুরাশ্রম**।

আর্য্যদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। তাছাড়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও এঁরা উন্নতি করেছিলেন।

আর্য্যদের ধর্ম :—আর্য্যরা দেবদেবী জ্ঞানে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে পূজা করতেন। যে সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য বা শক্তি মনে ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করত তাহাই আর্য্যদের উপাসনার বস্তু ছিল। যেমন—পৃথিবী, মরুৎ, রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্র ইত্যাদি। আর্য্য দেবতাদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন আকাশের দেবতা (মিত্র ও বরুণ), বায়ুর দেবতা (ইন্দ্র ও মরুৎ), পৃথিবীর দেবতা (অগ্নি ও সোম)। আর্য্যরা কিন্তু পৌত্তলিক ছিলেন না। দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে তাঁরা যাগ-যজ্ঞ করতেন এবং সাধারণতঃ ঘি, যব, মধু ইত্যাদি যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিতেন।

আর্য্যদের রাজনৈতিক জীবন :—প্রথম দিকে আর্য্যরা অনেক দলে

ও উপদলে বিভক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল না। ঋক্‌বেদে দশ রাজার যুদ্ধের কথা থেকেই এটা বোঝা যায়। এই যুদ্ধে ভরত-রাজ সুদাস দশটি আর্য্য রাজার মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপর সমাজে সার্বভৌম রাজশক্তির ধারণা বলবৎ হতে থাকে আর আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণ তাড়াতাড়ি ঘটতে থাকে।

রাজপদ সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক ছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা প্রজাদের দ্বারাও নির্বাচিত হতেন। কর আদায়, বিচার, যুদ্ধ পরিচালনা ও ধর্ম রক্ষা করা ছিল রাজার প্রধান কাজ।

(ঘ)

মহাকাব্য

স্মৃতিসাহিত্য রচনাকালের শেষ দিকে বীরগণের গল্প নিয়ে কাহিনী কাব্য রচিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এগুলি থেকেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দু'টি রচিত হয়। এই দু'টি মহাকাব্য থেকে আর্য্যযুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের বহু কথা জানা যায়।

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। অযোধ্যার রাজা দশরথের ছেলে রামচন্দ্র বাবার সত্য রক্ষার জন্যে ভাই লক্ষণ ও স্ত্রী সীতা সহ বনে যান। সেখানে লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে চুরি করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাম ভীষণ যুদ্ধ করে রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু প্রজাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি সীতাকে বনবাসে দেন। এই হল রামায়ণের মূল গল্প।

মহাভারত রচনা করেন বেদব্যাস। মহাভারতে আছে, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দু'ভাই। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত ছেলে আর পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব পাঁচ ছেলে। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলা হত কৌরব আর পাণ্ডুর ছেলেদের বলা হত পাণ্ডব। দ্বারকার অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের বন্ধু। তখন ভারতবর্ষ অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এক

অখণ্ড ভারত গড়তে চাইলেন। তাঁরই কৌশলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হল। কৌরবরা পরাজিত হলেন।

(৬)

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

বৈদিক যুগের সহজ, সরল ধর্ম ক্রমে জটিল হয়ে উঠল। কুসংস্কার ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য খুব বেড়ে গেল। অনেকে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এই প্রতিবাদকারীদের মধ্যে মহাবীর বর্ধমান ও গৌতম বুদ্ধ নামে দু'জন ক্ষত্রিয় দু'টি ধর্ম প্রচারের দ্বারা এই কুসংস্কার ও অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন।

জৈন ধর্ম ঃ—জৈন ধর্মাবলম্বীদের মতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই তীর্থংকর (ধর্ম প্রবর্তক) নামে পরিচিত চব্বিশ জন ধর্মগুরুর শিক্ষার দ্বারা জৈন ধর্ম পুষ্টিলাভ করে। এইসব তীর্থংকরের মধ্যে বাইশ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। মহাবীর পার্শ্বনাথ ছিলেন এই বাইশ জনের পরবর্ত্তী তীর্থংকর। তাঁর উপদেশগুলি চতুযাম নামে খ্যাত, যথা—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ।



মহাবীর

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শেষ তীর্থংকর বর্ধমানের আবির্ভাব ঘটে। ইনি বৈশালীর কাছে কুন্দগ্রামে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মান। এঁর বাবার নাম সিদ্ধার্থ ও মা ত্রিশলা, স্ত্রীর নাম যশোদা। ইনি তিরিশ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হন এবং বার বছর তপস্যা করে জিন (জিতেন্দ্রিয়) নামে পরিচিত হন। এই জিন কথাটি থেকেই জৈন শব্দের উৎপত্তি। তিরিশ বছর

ধরে তিনি অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করে পাটনার কাছে পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈনধর্ম।

জৈনধর্মমতঃ—পশুবলি প্রথা ও বেদের অনুশাসন জৈনরা স্বীকার করে না। জৈনরা অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে প্রত্যেক বস্তুরই প্রাণ আছে। এঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। জৈন-ধর্মমত অনুসারে জন্মান্তর ও কর্মফল থেকে উদ্ধার পেতে হলে যথার্থ বিশ্বাস, যথার্থ সদাচরণ ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করা দরকার। এগুলিকে ত্রিরত্ন বলে। জৈনদের ধর্ম গ্রন্থের নাম দ্বাদশ অঙ্গ। জৈনদের দু'টি শাখা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর।

বৌদ্ধধর্মঃ—বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। আনুমানিক ৫৬৭



বুদ্ধদেব

খৃষ্ট পূর্বাব্দে কপিলা বস্তুর শাক্য নামে এক ক্ষত্রিয় রাজবংশে গৌতম বা সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। এঁর বাবা ছিলেন শুদ্ধোধন ও মা মায়াদেবী। তাঁর স্ত্রীর নাম যশোধরা ও ছেলের নাম রাহুল। সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে সংসার ছেড়ে গয়ার কাছে উরুবিল্ব গ্রামে নৈরঞ্জনা নামে

নদীর ধারে এক বিশাল বটগাছের তলায় দীর্ঘদিন তপস্যা করেন। এখানে সিদ্ধার্থ বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এরপর তাঁর নাম হয় বুদ্ধ। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। পরমজ্ঞান লাভ করার পর তিনি কাশীর কাছে সারনাথে পঞ্চভিক্ষু নামে পরিচিত তাঁর অনুচরদের মধ্যে প্রথম তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। তিনি মগধ, কোশল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মহাকাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্ত, মোগ্গালান ও উপালি বুদ্ধের বাণীকে প্রচার ও জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধধর্মমত :—বৌদ্ধধর্মের মূলকথা অহিংসা। সংসারের দুঃখ কষ্ট থেকে মানুষ যাতে মুক্তি পায় এই ছিল বুদ্ধের একমাত্র কামনা। তিনি নির্বাণ লাভের জন্য আটটি পথের নির্দেশ দেন, একে অষ্টপন্থা বলে, এগুলি হল—(১) সৎ সঙ্কল্প. (২) সৎ চিন্তা, (৩) সৎ বাক্য (৪) সৎ স্মৃতি, (৫) সৎ জীবন যাপন, (৫) সৎ প্রচেষ্টা, (৭) সম্যক্ দৃষ্টি, (৮) সম্যক্ সমাধি।

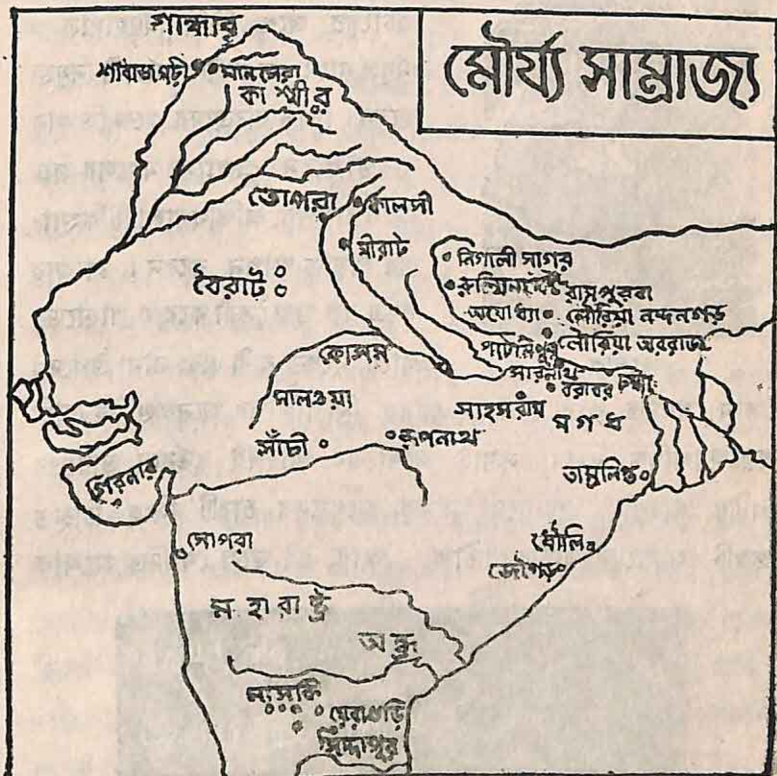
অষ্টপন্থা ছাড়াও বুদ্ধদেব কতকগুলি নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন এগুলিকে বলে শীল যেমন হিংসা, ব্যাভিচার, মদ্যপান, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা, মনঃসংযোগ ও অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক যথা—(১) বিনয় পিটক, (২) সুত্ত পিটক (৩) অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। বুদ্ধের পূর্ব জন্মের কথাকে জাতক বলে। বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও ভারতের বাইরে, মধ্য এশিয়া, সুদূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহুদেশে বিস্তার লাভ করে।

(চ)

ভারতীয় সাম্রাজ্য

মৌর্য্য সাম্রাজ্য :—আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন মগধের সিংহাসনে রয়েছেন নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নামে এক বীর যুবক চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে মগধের সিংহাসন দখল করেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হয় মৌর্য্যবংশ। তিনি ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নামে পরিচিত।



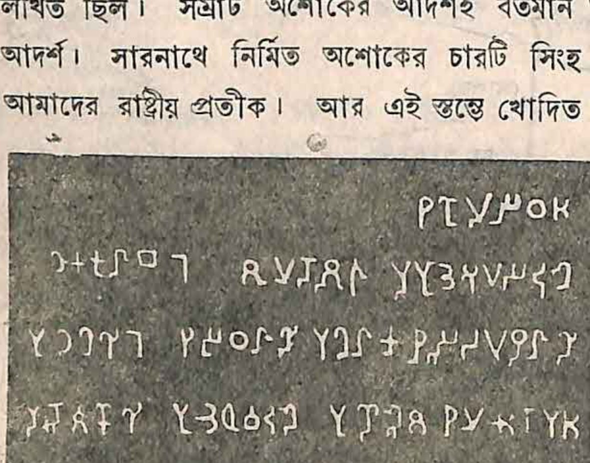
মালব, সৌরাষ্ট্র, কাবুল উপত্যকা ও মহীশূরের কিছু অংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসের কাছ থেকে তিনি উত্তর পশ্চিম ভারত উদ্ধার করেন। চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে বসেন বিন্দুসার।

অশোক ঃ—বিন্দুসারের পর তাঁর ছেলে অশোক খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ অব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রথম জীবনে অত্যাচারী ছিলেন। কলিঙ্গদেশের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অসংখ্য লোক মারা যায়। তারপর তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের

নিকট বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতের ইতিহাসে অহিংসা ও প্রজামঙ্গলের জন্য অশোক বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি শুধু ভারতেই নয় ভারতের বাইরেও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। অহিংসা ও মৈত্রীই ছিল তাঁর পররাষ্ট্র নীতির মূলকথা। ধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি ধর্মমহামাত্র ও ধর্মযুত নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনি দরিদ্রদের জন্যে ভিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি রাজপথ, অতিথিশালা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। রাজ্যের সর্বত্র বহু স্তম্ভ তৈরী করে ও পাহাড়ের গায়ে, বুদ্ধের বাণী এবং নানা উপদেশ তিনি খোদিত করে দেন। এইসব শিলালিপির অনেকগুলিই ব্রাহ্মী হরফে লিখিত ছিল। সম্রাট অশোকের আদর্শই বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। সারনাথে নির্মিত অশোকের চারটি সিংহ চিহ্নিত স্তম্ভটি আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। আর এই স্তম্ভে খোদিত অশোক



অশোক



ব্রাহ্মী হরফে লেখা অশোকের শিলালিপি

চক্রটি আমাদের জাতীয় পতাকায় স্থান পেয়েছে। অশোককে তাঁর মৈত্রী, অহিংসানীতি ও মানব কল্যাণের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের

মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলা চলে। ২৩২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অশোকের মৃত্যু হয় ও মগধের রাজশক্তি ক্রমশঃ তুর্বল হয়ে পড়ে।

কণিষ্ক :—মৌর্য্য সাম্রাজ্য যখন তুর্বল হয়ে পড়ে তখন চীন দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ইউ-চি নামে উপজাতির একটি শাখা কুষাণ বংশ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এদের প্রথম রাজা ছিলেন কুজুল কদফিস্। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর যার এখনকার নাম পেশোয়ার। কণিষ্ক যখন সিংহাসনে বসেন সেই সময় থেকে একটি সাল গণনা করা হয়। এটিকে বলে শকাব্দ। কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। কণিষ্ক বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কণিষ্ক শিল্প, স্থাপত্য ও শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ, দার্শনিক নাগার্জুন এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক চরক তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। কণিষ্কের পর থেকেই কুষাণ বংশের প্রাধান্য কমে যেতে থাকে।

গুপ্তবংশ :—খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধে গুপ্ত রাজগণের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের আদি রাজা ছিলেন **শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ** তাঁরা সম্ভবতঃ মগধের স্থানীয় রাজা ছিলেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মগধের প্রতিপত্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এলাহবাদ অযোধ্যা ও দক্ষিণ বিহারে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়।

সমুদ্রগুপ্ত :—প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। সমুদ্রগুপ্ত নিজে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মুদ্রায় তাঁর বীণা বাদনরত মূর্তি থেকেই



বীণা বাদনরত
সমুদ্রগুপ্ত

বোঝা যায়। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। অনেকে তাঁকে ভারতের নেপোলিয়ান বলে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য :—সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। ইনিই গল্পের বিক্রমাদিত্য। ইনি শকদের পরাজিত করেন বলে একে শকারি বলা হয়। তাঁর সময়ে মালব ও সৌরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে আসে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি গুণীর আদর করতেন। তাঁর সভায় ন'জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, একে নবরত্ন সভা বলা হত। এই সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন মহাকবি কালিদাস। চীন দেশের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে আসেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর প্রথম কুমার গুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তাঁর সঙ্গে পুষ্যমিত্র নামে এক দুর্ধর্ষ উপজাতির যুদ্ধ হয়। কুমার গুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হন। তিনি হুণদের বিতাড়িত করেন। আনুমানিক ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হুণরা পাঞ্জাব ও রাজপুতনা প্রভৃতি দখল করে। উত্তর প্রদেশের কনৌজে মৌখরী এবং থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ, বঙ্গদেশে শশাঙ্ক, সৌরাষ্ট্রে বলভীর মৈত্রক বংশ ও আরও অনেক ছোটবড় রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের আমলে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ হয়।

(ছ)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গদেশের বিবরণ

ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের অন্যতম অঞ্চল বঙ্গদেশ। এই বঙ্গদেশ বলতে এখন আমরা বুঝি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গদেশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিলেন অনার্য্য। বর্তমান বাঙ্গালী জাতি বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। অতীতকালে সমস্ত বঙ্গদেশের কোনো

একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। তবে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও পশ্চিমে গঙ্গানদী ও রাজমহল পর্বতমালার মাঝখানের ভূভাগকে তখনকার বঙ্গদেশ বলা যেতে পারে। এই ভূখণ্ডের ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বাঙলায় পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিম বাঙলায় রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত এবং দক্ষিণ বাঙলায় সমতট, হরিকেল ও পূর্ব বাংলায় বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিম বাঙলার কিছু কিছু অঞ্চলকে একত্রে গৌড় বলা হত।

আর্য্যদের বাঙলাদেশে বসবাস করতে আসার আগে থেকেই বাঙ্গালীদের নিজস্ব এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল। বীরভূম ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় মাটির নীচে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মনুসংহিতা রচনাকালে (২০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) বাঙ্গলা আর্য্যাবর্তের মধ্যে বলে মনে করা হত। মহাভারতে বাঙ্গলাদেশে অবস্থিত তীর্থের নাম আছে। রামায়ণে বাঙ্গলাদেশকে সমৃদ্ধ জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জৈনধর্ম গ্রন্থ "আয়ারঙ্গসুত্ত, কল্পসুত্ত ও ভগবতীসুত্ত" এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ "মিলিন্দ পঞহো" ও "জাতকে" বাঙ্গলাদেশ ও তার অধিবাসীদের কথা পাওয়া যায়। গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের আগের বাঙ্গলাদেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে শুধু জানা যায় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ) বাংলাদেশে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। আলেক-জাণ্ডারের ভারত ত্যাগের পর থেকে গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসও অন্ধকারে ঢাকা।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে গুপ্তশক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই সময়ের কিছু অনুশাসনে সমতট ও পুষ্করণ রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। হরিষেণের এলাহবাদ প্রশস্তিতে জানা যায় সমুদ্রগুপ্তের সময় সমগ্র বাঙ্গালাদেশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর বিবরণ থেকে ধারণা করা যায় গুপ্তদের আদিনিবাস ছিল বঙ্গদেশ।

দামোদরপুর তাম্রফলক থেকে জানা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উত্তর বাঙ্গলার উপর গুপ্ত রাজাদের কর্তৃত্ব ছিল।

(জ)

বৈদেশিক সংযোগ

অতি প্রাচীন কাল থেকেই বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। মৌর্য্য যুগে বিদেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। অশোকের ধর্ম প্রচারকগণ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক আলবেরুণীর বিবরণ থেকে জানা যায় সিরিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত খোরাসান, পারস্য, ইরাক ও মসুল প্রভৃতি দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটে। কুষাণ রাজগণের আমলে ভারতীয় সংস্কৃতি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। সেই সময় থেকে চীন দেশে ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণের যাতায়াত শুরু হয়।

মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় বাণিজ্যের সূত্রধরে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় বণিকগণ পণদ্রব্য নিয়ে হিন্দুকুশ পার হয়ে ব্যাকট্রিয়া যেতেন। ব্যাকট্রিয়া ছিল ভারত, চীন ও পশ্চিমী দেশগুলির মিলন স্থল। খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার অরেলস্টাইন-এর গবেষণার ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু চিহ্ন পাওয়া গেছে। এইসব চিহ্নের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রা উল্লেখযোগ্য। খোটান অঞ্চলে আবিষ্কৃত মুদ্রা ও লিপিতে রাজ কর্মচারীদের নামের মধ্যে ভীম, ভঙ্গসেন, নন্দসেন ইত্যাদি ভারতীয় নাম পাওয়া গেছে। মধ্য এশিয়ার কুচী, তুরফান ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চল থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীন, জাপান ও কোরিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মালয়, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে।

(ঝ)

বিদেশী ভ্রমণকারীগণের বিবরণ

ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশী ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারী এসেছিলেন, তাঁদের বিবরণ থেকেও সে সময়ের ভারতবর্ষের বহু খবর জানা যায়।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ :—মেগাস্থিনিস নামে এক গ্রীক দূত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময়ে ভারতে এসেছিলেন। তিনি সে সময়ের ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবরণ তাঁর "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থে লিখে রেখে যান।

সে যুগে রাজার ক্ষমতা ছিল খুব বেশী, যদিও রাজাকে জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হত। উৎপন্ন ফসলের চার ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসাবে দিতে হত। ভারতবর্ষ ধনধান্যে ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। জনসাধারণ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত। চুরি, ডাকাতি ছিল না বললেই চলে। লোকে সরল ও সত্যবাদী ছিল। তারা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করত। সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল। নারী জাতির মর্যাদা ছিল।

সে যুগের সমাজ দার্শনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, শিল্পী, যোদ্ধা, পরিদর্শক ও অমাত্য এই সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল খুব সমৃদ্ধ নগরী।

ফা-হিয়েনের বিবরণ :—চীনদেশের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে আসেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সকলেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। খাজনার পরিমাণ ছিল খুব কম। আইন-কানুন ও দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না। দেশে চুরি ডাকাতি ছিল না। খাদ্য দ্রব্যের কোন অভাব ছিল না। তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। দেশের সকলেই সমৃদ্ধিশালী ছিল। মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় এবং দরিদ্র

অনাথ আতুরদের জন্য বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল। দেশে বড় বড় শহর ছিল। পাটলিপুত্র ছিল রাজধানী। সে সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতিও লোকে শ্রদ্ধাশীল ছিল।

(ঞ)

প্রাচান ভারতের শিল্প, ভাস্কর্য্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিবরণ

মৌর্য্য যুগ ঃ—মৌর্য্য যুগে উন্নত শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। অশোকের স্তম্ভলিপি, "ভারুত" ও "সাঁচীর" স্তূপগুলি এবং গয়ার কাছে "আজিবক" গুহাগুলি মৌর্য্য যুগের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মৌর্য্যোত্তর যুগে গ্রীক ও পারসিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্পরীতির জন্ম হয়। বোধিসত্বের বিভিন্ন মূর্তিতে এই শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মৌর্য্য যুগে শিক্ষার বহুল প্রচলন ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী ও বারাণসীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার প্রধানকেন্দ্র ছিল। অনেকের মতে কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র," ভদ্র বাহুর "কল্পসূত্র" ও বৌদ্ধ গ্রন্থ "কথাবত্ত" এই যুগেই রচিত হয়।

কুষাণ যুগেও শিল্প-স্থাপত্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বসুমিত্র ও অশ্বঘোষ, দার্শনিক নাগার্জ্জুন এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী চরক এই যুগে জন্মান।

গুপ্তযুগ ঃ—গুপ্তযুগের শিল্পকলাও খুব উন্নত ছিল। ঝাঁসী জেলার দেওগড়ে একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির এবং এখানে প্রাপ্ত শিব, বিষ্ণু ও অপরাপর দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি এ যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। গুপ্তযুগে চিত্র শিল্পেরও খুব উন্নতি হয়। অজন্তার গুহাচিত্রগুলি অধিকাংশ এ যুগেই তৈরী হয়। চিত্রগুলির মধ্যে "মা ও ছেলে," "মৃত্যু পথযাত্রী রাজকুমারী" ও "নীল পদ্ম হস্তে বোধিসত্ব" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিত্রশিল্পের এরূপ অপূর্ব সৃষ্টি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

গুপ্ত যুগে সাহিত্যের এক অপূর্ব বিকাশ ঘটে। এ যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। কালিদাস রচিত "শকুন্তলা," "মেঘদূত," "কুমার সম্ভব" ইত্যাদি কাব্য ও নাটক বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। "মৃচ্ছকটিক" রচয়িতা শূদ্রক, "মুদ্রারাক্ষস" রচয়িতা বিশাখদত্ত ও হরিষেণ প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীগণ এ যুগেই জন্মান। সাহিত্য ছাড়াও জ্যোতিষ, গণিত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানেও ভারত এ যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। আর্যভট্ট ও বরাহ-মিহির ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। দশ-কে ভিত্তি করে যে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি, আজ সারা বিশ্বে প্রচলিত তা এ যুগেই আবিষ্কৃত হয়। পৃথিবী ঘুরছে এই সত্যটি আর্যভট্ট প্রথম প্রমাণ করেন। ভারতীয়রা এই যুগে জ্যামিতির বহু কঠিন বিষয় সমাধান করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ধন্বন্তরীর নাম ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ ধাতু শিল্পের উৎকর্ষতার নিদর্শন। শিল্প, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির এই চরম উন্নতির জন্যে গুপ্তযুগকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলে।



অজন্তার চিত্র (মা ও ছেলে)

নালন্দা :—পরবর্ত্তী কালে নালন্দা এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত হয়। ভারত ও ভারতের বাইরের প্রায় দশহাজার ছাত্র এখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন এখানকার অধ্যক্ষ। বিহারের রাজগীরের কাছে এর চিহ্ন, মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এখানে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পড়েন। ভারতের প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র তক্ষশীলা। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ভারতবাসী হিসাবে আমাদের এসব উন্নত সভ্যতার জন্যে আমরা

গর্ববোধ করি। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা এক মহান জাতির বংশধর। তোমরা আগামী যুগের নাগরিক ; তোমরা এ সুমহান সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে আরও মহামান্বিত করবে। তোমাদের চেষ্টায় ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে।

অনুশীলনী

লৌহ যুগের সমাজ :

১। পৃথিবীর মধ্যে প্রথম কোথায় লোহার ব্যবহার শুরু হয় ?

২। ভারতে প্রথম কখন লোহার ব্যবহারের কথা জানা যায় ?

৩। লোহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন যাত্রার কি কি পরিবর্তন দেখা গেল ?

ব্যাবিলন :

১। ব্যাবিলনীয়দের কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যা জান লিখ।

২। হামুরাবি কে ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত ?

৩। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিবরণ দাও।

মিশর :

১। তৃতীয় থাটমোস কে ছিলেন ? তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে যা জান লিখ।

২। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে পুরোহিতের স্থান কোথায় ছিল ? তাঁদের প্রভাব পতিপত্তির পরিচয় দাও।

৩। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হত কোথায় এবং কাদের দ্বারা ?

ইরাণ :

১। (ক) কার নেতৃত্বে পারসিক সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে ?
(খ) আজ থেকে কতদিন আগে পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থান হয় ?

২। (ক) ম্যারাথনের যুদ্ধ কোন্ কোন্ দুই শক্তির মধ্যে হয় ?
(খ) এই যুদ্ধে কোন্ শক্তি জয়ী হয়।
(গ) বর্তমানের কোন্ বিষয়ের সঙ্গে এটি জড়িত হয়ে আছে ?

৩। (ক) কোন্ যুদ্ধ স্পার্টার সৈন্যদের সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্যে অমর হয়ে আছে।
(খ) এই যুদ্ধের সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৪। জরথুষ্ট্র কে? তাঁর ধর্মের মূলকথা কি? এই ধর্ম ভারতে কাদের মধ্যে প্রচলিত আছে? তাদের মৃতদেহ সৎকারের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ইহুদী জাতি ঃ

১। ইহুদীরা মিশরে কিভাবে নির্যাতিত হত।

২। কার নেতৃত্বে কিভাবে ইহুদীরা মিশর থেকে পালিয়ে যায়?

৩। তারা কোথায় বসতি স্থাপন করে? ইহুদী রাজ্য কিভাবে ধ্বংস হয়?

গ্রীস ঃ

১। হোমার কে? তিনি কি কি মহাকাব্য লেখেন?

২। হোমরীয় যুগে গ্রীসের লোকদের জীবন-যাত্রার বর্ণনা দাও।

৩। (ক) এথেন্স-এ স্পার্টা কোন্ দেশের অন্তর্গত ছিল?
(খ) এ দু'টি দেশে কিকি ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল?

৪। স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৫। এথেন্সের শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। এথেন্স ও স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রার মধ্যে কোন্‌টিকে তোমার ভাল মনে হয় এবং কেন?

৭। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাস্কর্য্যের বিবরণ দাও।

৮। সক্রেটিস কে ছিলেন? এথেন্সের সাংস্কৃতিক উন্নতিতে তাঁর অবদান কি?

রোম ঃ

১। হ্যানিবল কে ছিলেন? হ্যানিবলের নেতৃত্বে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। প্রাচীন রোম সমাজের একটি চিত্র অঙ্কিত কর।

৩। স্পার্টাকাস কে? তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন কেন?

৪। অক্টোভিয়াসের সময়ে রোমের অগ্রগতির বিবরণ দাও।

৫। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারক কোন্ জাতির লোক? এই ধর্মের মূল কথা কি?

চীন ঃ

১। ইনের ঢিবি কি? এখান থেকে মনে রাখবার মত কি জিনিষ বেরিয়েছে। এগুলির জন্য ব্যবহৃত হত কি?

২। সাং যুগে চীনের শিল্প ও স্থাপত্যের বিবরণ দাও।

৩। কনফুসিয়াসের সময়ে চীনের অবস্থা বর্ণনা কর।

৪। কনফুসিয়াসের বাল্য জীবন, শিক্ষা ও মতবাদ বর্ণনা কর।

ভারতবর্ষ :

১। (ক) অর্য্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল ?

(খ) তাঁরা প্রথমে কোথায় বসবাস করেন ?

২। (ক) বেদ কি ? ইহা কয়ভাগে বিভক্ত ও কি কি ?

(খ) সবচেয়ে প্রাচীন বেদ কোন্‌টি ? এতে কি আছে ?

৩। আর্য্যদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৪। ভারতীয় মহাকাব্য দুটি কি কি ? এ দুটির রচয়িতাগণের নাম কর।

৫। মৌর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির নাম কর। কেন তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় ?

৬। (ক) গুপ্তবংশের দু'জন শক্তিশালী সম্রাটের নাম কর।

(খ) এঁদের মধ্যে যাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কর।

৭। কণিষ্ক কোন্ বংশের রাজা ? তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? তাঁর সময়ের দু'জন প্রসিদ্ধ মনীষীর নাম কর। তাঁরা কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন ?

৮। প্রাচীন কোন্ কোন্ পুস্তকে প্রাচীন বঙ্গদেশের বিবরণ জানা যায় ?

৯। মেগাস্থিনিস কোন্ দেশের লোক ? তাঁর বিবরণ থেকে সে সময়ের ভারতবর্ষের কি কি খবর জানা যায়।

১০। ফা-হিয়েন কে ? তিনি কার সময়ে ভারতে আসেন ? তিনি কি লিখে যান ?

১১। মৌর্য্য যুগের শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির বিবরণ দাও।

১২। গুপ্ত যুগকে ভারতের স্বর্ণ যুগ বলা হয় কেন ?

১৩। নালন্দা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী

লৌহযুগ :

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর পাশে ডানদিকে দেওয়া আছে যেটি যার ঠিক উত্তর তার পাশে লিখ।

(ক) কোন্ সময়ে অসিরীয়রা লোহাকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ?	প্রায় ৩০০০ বছর পরে।
(খ) চীনে লোহার ব্যবহার হয় কখন ?	প্রায় ৭০০—৬২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে।

(গ) মানবজাতি উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলার কতদিন পরে লোহাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ? — প্রায় ৫০০-২৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে।

২। নিচের প্রশ্নগুলির পাশে হু'টি করে উত্তর দেওয়া আছে যেটি অধিকতর ঠিক সেটি লিখ।

(ক) মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে জনপদ কার দ্বারা শাসিত হত ? —দলপতি, রাজা।

(খ) আর্য্য যুগেও যে লোহার ব্যবহার ছিল এটি কি থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায়—মহাকাব্য, বেদ।

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে—যুগেই লোহার ব্যবহারের কথা জানা যায়।

(খ) আনুমানিক——খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে অসিরীয়রা লোহাকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করে।

৪। নীচের লেখা ধাতুগুলির মধ্যে মানুষ কোন্‌টি সবশেষে ব্যবহার করতে শেখে—ব্রোঞ্জ, তামা, সোনা, রূপা, লোহা।

ব্যাবিলন :

১। নীচের ঐতিহাসিক তথ্যগুলিতে ভুল আছে ঠিক করে লিখ :—

(ক) ব্যাবিলনীয়দের থেকে সুমেরীয়রা শিল্পকর্মে আরও দক্ষ হয়ে উঠে।

(খ) ব্যাবিলনীয় সমাজে পুরোহিতের তত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না।

(গ) গিলগামেশের মহাকাব্য মিশরীয়দের একটি অমূল্য সম্পদ।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) নগর দেবতা——মন্দিরটি ছিল শহরের মাঝখানে। (খ) ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানটি তৈরী করান রাজা——। (গ) ——পৃথিবীর মানুষ লিপিবদ্ধ আইনকানুন পায়।

৩। ঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :—

ব্যাবিলন নগরকে ভিত্তি করেই এই সভ্যতা গড়ে উঠে বলে এই সভ্যতাকে ব্যাবিলনীয়/মিশরীয় ও সিন্ধু-সভ্যতা বলে।

মিশর :

১। নীচের নামগুলি সময়ের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লিখ :—

হামুরাবি, তৃতীয় থাটমোস, নেবুকাড্‌নেজার।

২। নীচের প্রশ্নটির তিনটি উত্তর দেওয়া আছে ঠিক উত্তরটি বের কর :—
কোন্ পারস্ত সম্রাট মিশর জয় করেন? —ক্যামবাইসেস, দারায়ুস, জেরেক্সেস।

৩। নীচের তথ্যটি যথাযথ ভাবে সাজাও।
মিশরে শিক্ষার ভারছিল ফ্যারাওদের উপর, শাসনের ভারছিল, পুরোহিতদের উপর।

৪। শূন্যস্থানে নীচের শব্দগুলির দ্বারা পূর্ণ কর :—
পুরোহিত, জেরেক্সেস; মোশি।
(ক) ——মিশরের বিদ্রোহ দমন করেন। (খ) মিশরীয় সমাজ ব্যবস্থায়—— সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। (গ)——নামে এক নেতার চেষ্টায় ইহুদীরা মিশর থেকে মুক্তি পায়।

ইরাণ :

১। শূন্যস্থান উপযুক্ত ঐতিহাসিক শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর :—
(ক) পারস্য সম্রাট——ভারতের এক বিস্তীর্ণঅঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।
(খ) অলিম্পিক খেলাধুলায় একটি দৌড় প্রতিযোগিতা—স্মৃতির সংগে জড়িত।
(গ) প্রাচীন ইরাণীয়দের ধর্মগ্রন্থ——।

২। নীচের প্রশ্নটির দুটি উত্তর দেওয়া আছে যেটি ঠিক সেটি লিখ :—
স্পার্টানদের দেশপ্রেম ও বীরত্বের জন্য অমর হয়ে আছে—থার্মোপিলীর যুদ্ধ, ম্যারাথনের যুদ্ধ।

৩। যেটি ঠিক সেটির নীচে দাগ দাও :—
জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত ধর্মের মতে মঙ্গলময় দেবতার নাম—অর্হিমান, আহুর মাজদা।

৪। নীচের নামগুলির মধ্যে কোন্‌টি ইরাণের সংগে যুক্ত :—
তৃতীয় থাটমোস, নেবুকাড্‌নেজার, জরথুষ্ট্র।

ইহুদী :

১। নীচের শব্দগুলি দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—
মোজেস, প্যালেষ্টাইনে, ফিলিস্তিনরা।
(ক) ইহুদীরা—বসতি স্থাপন করে। (খ) —ইহুদীদের মিশর থেকে উদ্ধার করেন। (গ)——আগে বাস করত ক্রীট দ্বীপে।

২। দু'দিকে তিনটি শব্দ আছে যেটি যার সংগে মেলে তার সংগে মেলাও :—

(ক) নেব্যুকাড্‌নেজার, মোজেস, যিহোবা, ব্যাবিলন, ইহুদী, ঈশ্বর।

(খ) তিনটি শব্দ আছে ও পাশে বক্তব্য আছে এর মধ্যে যেটি বক্তব্যের সংগে মেলে না সেটি বের কর :—

সল, জডিয়া, দায়ুদ——ইহুদীদের রাজা।

৩। নীচে তিনটি সময় দেওয়া আছে যেটি ঠিক সময় তার পাশে এই (√) টিক চিহ্ন দাও।

নেব্যুকাড্‌নেজার জেরুজালেম আক্রমণ করে ইহা ধ্বংস করেন—

খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দ, খৃষ্টপূর্ব ২৩৭ অব্দ, ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দ।

গ্রীস ঃ

১। নীচের প্রশ্নটির তিনটি উত্তর আছে যেটি ঠিক তার পাশে (√) টিক চিহ্ন দাও :—

ইলিয়ড ও ওডেসী রচনা করেন কে? —হোমার, ফিদিপাইদিস, থুসিডিডিস।

২। নীচের নামগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক ও নাট্যকারের নাম দু'টি বেছে বের কর?

এ্যাপোলো, লাইকারগাস, সফোক্লিস, হেরোডটাস, সক্রেটিস।

৩। নাম দু'টির মধ্যে যেটি অধিকতর শ্রেষ্ঠ সেটি বের কর :—স্পার্টা, এথেন্স।

৪। ঐতিহাসিক সত্যটিতে ভুল আছে ঠিক করে লিখ :—

পেরিক্লিসের আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন থুসিডিডিস এবং প্রথম ইতিহাস প্রণেতা ছিলেন ইউরিপিডিস।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) ডেলফি নামক স্থানে —— দেবতার মন্দির ছিল।

(খ) প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে —— ও —— ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত।

(গ) তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর ছিলেন ——।

৬। যেটি ঠিক সেটিতে ভুল সেটি বেছে বের কর :—

গ্রীক নাট্য সাহিত্যে ট্রাজেডী রচনায় ঈস্‌কিলাস, সফোক্লিস ও প্রহসন রচনায় ইউরিপিডিস অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন।

ম্যাসিডন ঃ

১। যেটি ঠিক সেটি রেখে অন্যটি কেটে দাও :—

(ক) প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন আলেকজাণ্ডার / দারায়ুস।

(খ) আলেকজাণ্ডার মিশরের/ম্যাসিডনের অধিপতি ছিলেন।

(গ) পুরু/অম্ভি প্রথমে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেন।

২। শূন্যস্থান উপযুক্ত ঐতিহাসিক শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর :—

(ক) ——শহরে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

(খ) আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন মগধের রাজা ——।

৩। ঐতিহাসিক সত্য গুলিতে ভুল আছে ঠিক করে লিখ।

(ক) খৃষ্টপূর্ব ৩১৫ অব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

(খ) খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

(গ) আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ২৫০ বছরের মধ্যেই গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন হয়।

রোম :

১। নীচের লেখা নাম দুটির মধ্যে কার নাম অনুসারে রোম নগরীর নাম করণ হয় ?—রেমুলাস ও রীমাস।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) ——ভাই হ্যানিবল রোমান সেনাপতি সিপিওর অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত ও নিহত হন।

(খ) রোম শাসন ব্যবস্থায় অধিকারভোগী অভিজাত সম্প্রদায়কে বলা হত ——।

(গ) ——নেতৃত্বে একদিন ক্রীতদাসদের বিক্ষোভ ফেটে পড়ল বিদ্রোহরূপে।

৩। নীচের ঐতিহাসিক সত্য গুলিতে ভুল আছে ঠিক করে লিখ :—

(ক) জুলিয়াস সীজারকে রোমের সিনেট আগাষ্টাস উপাধি দেয়।

(খ) রোমের স্টেডিয়ামে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি জন্তুর সঙ্গে মানুষের লড়াই হত।

(গ) অক্টোভিয়ান ছিলেন রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

৪। নীচের নামগুলির মধ্যে কোন্ কোনটি রাজা ও কোন্ কোনটি ধর্মপ্রচারকের নাম বল ?—যীশুখৃষ্ট, দারায়ুস, জরথুষ্ট্র, ফিলিপ।

চীন :

১। নীচের ডানদিকে ও বাঁদিকে কতকগুলি বিষয় দেওয়া আছে যেটি যার সংগে মেলে মেলাও।

(ক) সাং রাজবংশ	সাং বংশের পর রাজত্ব করে,
(খ) চীনের মহাপ্রাচীর	সাং রাজবংশের সময়,
(গ) চৌ-রাজবংশ	চৌ-রাজবংশের রাজত্বকালে,
(ঘ) কন্‌ফুসিয়াস	ইনের ঢিপি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

২। পাশে দুটি উত্তর আছে যেটি ঠিক সেটিতে দাগ দাও :—

কনফুসিয়াসের জন্ম হয়—খৃষ্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে, খৃষ্টপূর্ব ৪৭৮ অব্দে।

৩। নীচের তিনটি নামের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি চীনের সংগে যুক্ত :—

কচ্ছপের খোলে খোদাই লিপি, মাটির টালীতে লেখা লিপি, শিলালিপি।

ভারতবর্ষ :

১। নীচের শূন্যস্থানগুলি ঐতিহাসিক সত্য দ্বারা পূর্ণ কর :—

(ক) আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃঢ়বিশ্বাস যে আর্য্যগণ—কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করত। (খ) — অপর নাম শ্রুতি। (গ) মহাভারত ভারতের প্রাচীন——। (ঘ) বৌদ্ধ ধর্মমত অনুসারে মুক্তি লাভের জন্য করণীয় আটটি উপায়কে — বলে। (ঙ) কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা —।

২। নীচের ঐতিহাসিক সত্যগুলিতে ভুল আছে ঠিক করে লিখ :—

(ক) কুষাণ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন কালিদাস।

(খ) তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের পূর্ববর্তী সময়ের বঙ্গদেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই।

(গ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মেগাস্থিনিস নামক গ্রীক দূত ভারতে আসে।

(ঘ) অজন্তা গুহা চিত্রগুলি অধিকাংশই মৌর্য্য যুগে অঙ্কিত হয়।

(ঙ) শূদ্রক 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটি রচনা করেন।

৩। নীচে দু'দিকে দু'টি বিষয় আছে যেটি যার সঙ্গে মিলে সেভাবে মিলিয়ে লিখ :—

(ক) সবচেয়ে প্রাচীন বেদ	বাল্মীকি,
(খ) ভারতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট	ঋক্‌বেদ,
(গ) ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ	আর্যভট্ট,
(ঘ) প্রাচীন ভারতের মহাকবি অশোক	অশোক,
(ঙ) প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক	গুপ্তযুগ।

৪। নীচের বিষয়গুলি উল্টো পাল্টা করে সাজান আছে বিভিন্ন বিষয়গুলি থেকে ভুল অংশগুলি সরিয়ে এনে যার সংগে যেভাবে ঠিকমত যুক্ত হয় তার সংগে যোগ কর :—

আর্য্য সমাজে—অহিংসা পরম ধর্ম, অশোকের রাজত্বকালে—চতুরাশ্রম, জৈন ধর্মমতে—ধর্মমহামাত্য, সমুদ্রগুপ্তকে—কালিদাস, শকুন্তলা— ভারতের নেপোলিয়ন।

যুগরেখা

— আনুমানিক খ্রী: পূ: ২৫০০ অব্দ—আর্য্যদের ভারতে আগমন।
— " " ১২০০—১০০০ অব্দ—ঋক্‌বেদের রচনা কাল।
— " " ৭২০ অব্দ—ইহুদী সাম্রাজ্যের পতন।
— " " ৭০০—৬০০ " জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব।
— " " ৫৬৬—৪৮৬ " বুদ্ধ।
— " " ৫৫০ " পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
— " " ৫৫১—৪৭৮ " কনফুসিয়াস।
— " " ৪৬১ " পেরিক্লিস।
— " " ৩২৭—৩২৫ " আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান।
— " " ২৭৩—২৩২ " অশোকের সিংহাসনে আরোহণ।
— " " ২৭ " রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

— 0 যীশুখ্রীষ্টের জন্ম

— " ৭৮ খৃষ্টাব্দ কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ।
— " ৩৪০ " সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ।

———

পরিশিষ্ট

মৌখিক প্রশ্নাবলী ও আদর্শ উত্তর

মৌখিক প্রশ্ন অথবা ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তোমরা অনেকেই এক কথায় উত্তর দাও। যেমন প্রশ্ন করা হ'ল—**রোমে ক্রীতদাস বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন কে? তার উত্তরে অনেকেই বল—স্পার্টাকাস,** কিন্তু এরূপ উত্তর বলবে না। এর বদলে উত্তর দিতে হবে—**রোমে ক্রীতদাস বিদ্রোহে, ক্রীতদাসদের নেতৃত্ব দেন স্পার্টাকাস নামে একজন সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক্রীতদাস।** মনে রাখবে পূর্ণবাক্যে সংক্ষিপ্ত করে যথাযথ উত্তর দিতে হবে। যাতে তোমরা ঠিকমত উত্তর দিতে পার তারজন্যেই কতকগুলি ছোট ছোট প্রশ্নের আদর্শ উত্তর নীচে দেওয়া হ'ল।

১। প্রশ্ন :— ইতিহাস কি?

উত্তর :— মানব সভ্যতার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ধারাবাহিক অতীত বিবরণই ইতিহাস।

২। প্রঃ—প্রাচীনযুগের ইতিহাস রচনার উপাদান গুলির কয়েকটির নাম কর।

উঃ—প্রাচীনযুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলির মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা, উপকথা ও ধর্মপুস্তক এবং লিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। প্রঃ—ফ্রান্স ও স্পেনে ত্রিশহাজার বছর আগেকার যে সব মানুষের অস্থি, কঙ্কাল ইত্যাদি পাওয়া গেছে নৃতত্ত্ববিদেরা এই মানুষদের কি নাম দিয়েছেন?

উঃ—নৃতত্ত্ববিদেরা এই সব মানুষের নাম দিয়েছেন নিয়েনডারথেল মানুষ।

৪। প্রঃ—কতদিন আগে কোন্ মানবগোষ্ঠী প্রথম আগুন জ্বালতে শেখে?

উঃ—খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ৩০০,০০০ বৎসর আগে পিকিং মানবগোষ্ঠীই প্রথম আগুন জ্বালতে শেখে।

৫। প্রঃ—আদিম মানুষদের আঁকা ছবির নিদর্শন কোন্ গুহাগাত্রে পাওয়া গেছে?

উঃ—আদিম মানুষের আঁকা ছবির নিদর্শন স্পেনের আলতামিরা গুহাগাত্রে পাওয়া গেছে।

৬। প্রঃ—প্রাচীনযুগে কোন্ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য হোত?

উঃ—প্রাচীনযুগে বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য হোত।

৭। প্রঃ—রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল কিরূপে ?

উঃ—মানুষ নিজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়েছে। ক্ষুদ্র জনপদ ক্রমে রাজ্যে পরিণত হয় এবং কালক্রমে আয়তন বৃদ্ধি করে ও আইন কানুন তৈরী করে রাষ্ট্রের রূপ নিল।

৮। প্রঃ—পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি কোন্ কোন্ স্থানে গড়ে উঠেছিল ?

উঃ—পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি সম্ভবতঃ মিশরের নীল নদ, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে, ভারতে সিন্ধু উপত্যকায় ও চীনে হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর তীরে গড়ে উঠে।

৯। প্রঃ—সুমেরীয়, মিশরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টিতে লোহের ব্যবহারের কথা জানা গেছে ?

উঃ—সুমেরীয়, মিশরীয় ও সিন্ধুসভ্যতার মধ্যে কেবলমাত্র সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী নিনেভে লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

১০। প্রঃ—চিত্রলিপি ও কীলকলিপির মধ্যে কোন্‌টি মিশরীয়রা ব্যবহার করত ?

উঃ—চিত্রলিপি ও কীলকলিপির মধ্যে মিশরীয়রা চিত্রলিপি ব্যবহার করত।

১১। প্রঃ—মিশরীয় সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি ?

উঃ—মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার চেয়ে সিন্ধু সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার উন্নত ধরণের নগর সভ্যতা।

১২। প্রঃ—প্রাচীন যুগে চীনারা কি থেকে কাপড় বুনত ?

উঃ—প্রাচীন যুগে চীনারা রেশম ও গাছের আঁশ থেকে কাপড় বুনত।

১৩। প্রঃ—ভারতবর্ষে কোন্ যুগে লোহার ব্যবহারের কথা জানা যায় ?

উঃ—বেদে লিখিত "অয়স্" নামক একটি শক্ত ধাতুর উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় আর্যসভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার ছিল।

১৪। প্রঃ—কোন্ দেশের কোন্ প্রাচীন রাজার কাছ থেকে পৃথিবীর সভ্যমানুষ প্রথম লিপিবদ্ধ আইন কানুন পায়।

উঃ—মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অন্তর্গত ব্যাবিলনের হামুরাবি নামে এক রাজার সে যুগের প্রচলিত আইন কানুনের সংকলন থেকেই পৃথিবীর সভ্যমানুষ প্রথম লিপিবদ্ধ আইন কানুন পায়।

১৫। প্রঃ—ম্যারাথনের যুদ্ধ বর্তমান যুগের কোন্ বিষয়ের সংগে জড়িত হয়ে আছে ?

উঃ—ম্যারাথন যুদ্ধের "ম্যারাথন" কথাটি অলিম্পিক খেলাধূলার একটি দৌড় প্রতিযোগিতার নামের সংগে জড়িত আছে। এটির নাম "ম্যারাথন রেস"।

১৬। প্রঃ—আমাদের ভারতে জরথুস্ত্রের শিষ্য কারা ?

উঃ—আমাদের বর্তমান ভারতে পার্শীরা জরথুস্ত্রের শিষ্য।

১৭। প্রঃ—বর্তমানে ইহুদীদের রাষ্ট্র কোন্‌টি ?

উঃ—বর্তমানে ইস্রায়েল ইহুদীদের রাষ্ট্র।

১৮। প্রঃ—গ্রীসের প্রাচীন দু'টি মহাকাব্যের নাম কি ?

উঃ—গ্রীসের প্রাচীন দুটি মহাকাব্যের নাম হোমারের লেখা "ইলিয়ড্ ও ওডেসী"।

১৯। প্রঃ—পেরিক্লিস কোন্ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ?

উঃ—পেরিক্লিস গ্রীস দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

২০। প্রঃ—ইতিহাসের জনক বলা হয় কাকে ?

উঃ—এথেন্সের অধিবাসী হেরোডটাস পৃথিবীতে প্রথম ইতিহাস রচনা করে ইতিহাসের জনক বলে পরিচিত হন।

২১। প্রঃ—আলেকজাণ্ডার কোন্ সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ?

উঃ—আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারত আক্রমণ করেন।

২২। প্রঃ—পিউনিক যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল ?

উঃ—পিউনিক যুদ্ধ রোমান ও কার্থেজ বাসীদের মধ্যে হয়েছিল।

২৩। প্রঃ—রোমে শাসন ব্যবস্থায় ট্রিবিউন নামক প্রতিনিধিরা কাদের স্বার্থরক্ষা করত ?

উঃ—ট্রিবিউন নামক প্রতিনিধিরা অনভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করত।

২৪। প্রঃ—রোমের সেনেট কোন্ সম্রাটকে "অগাষ্টাস" উপাধি দেন ?

উঃ—অক্টোভিয়ান নামে এক সম্রাটকে রোমের সেনেট "অগাষ্টাস বা মহামহিমান্বিত" উপাধি দেন।

২৫। প্রঃ—ভার্জিল কে ছিলেন ?

উঃ—"ইনিড্" নামক গ্রন্থের রচয়িতা প্রাচীন রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ভার্জিল।

২৬। প্রঃ—কোন্ রোমান সম্রাট খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে ?

উঃ—রোম সম্রাট কন্‌স্টানটাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে।

২৭। প্রঃ—চীনের মহাপ্রাচীর কোন্ রাজবংশের রাজত্বকালে নির্মিত হয় ?

উঃ—সাং রাজবংশের রাজত্বকালে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মিত হয়।

২৮। প্রঃ—৫৫১ খৃষ্টাব্দ কি জন্য বিখ্যাত ?
উঃ—চীন দেশের মহাপণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক ও চিন্তানায়ক কন্‌ফুসিয়াসের জন্মের জন্য ৫৫১ খৃষ্টাব্দ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

২৯। প্রঃ—আর্য্যরা কখন ভারতে আসেন ?
উঃ—আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে আর্যাদের একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

৩০। প্রঃ—ভারতীয় সভ্যতার মূল কাঠামো কি ?
উঃ—আর্য্য ও অনার্য্যদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের মিলনের ফলে যে মিশ্র সভ্যতা গড়ে উঠে তাই ভারতীয় সভ্যতার মূল কাঠামো।

৩১। প্রঃ—বেদের কয়টি ভাগ ও কি কি ?
উঃ—বেদের চারটি ভাগ, যথা—ঋক্, সাম্, যজু, অথর্ব।

৩২। প্রঃ—চতুরাশ্রম কি ?
উঃ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ; আর্য্যজীবনের এই চারটি ভাগকে বলা হোত চতুরাশ্রম।

৩৩। প্রঃ—পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধের কাহিনী কোন্ মহাকাব্যে আছে ?
উঃ—বেদব্যাস রচিত "মহাভারত" নামক মহাকাব্যে পাণ্ডব ও কৌরবদের যুদ্ধের কাহিনী আছে।

৩৪। প্রঃ—ভারতীয় কোন্ হিন্দু সম্রাটের আদর্শ বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ?
উঃ—মৌর্য্যসম্রাট অশোকের অহিংসা ও মৈত্রীর নীতিই বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

৩৫। প্রঃ—নবরত্ন সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নের নাম কি ?
উঃ—বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন, মেঘদূত ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা মহাকবি কালিদাস।

৩৬। প্রঃ—"ইণ্ডিকা" গ্রন্থটি কার রচিত ?
উঃ—ইণ্ডিকা গ্রন্থটি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময় ভারতে আগত মেঘাস্থিনিস নামক গ্রীক দূত কর্তৃক রচিত হয়।

৩৭। প্রঃ—কোন্ কোন্ শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্পরীতি গড়ে উঠে ?
উঃ—মৌর্য্যোত্তর যুগে গ্রীক ও পারসিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্পরীতি গড়ে উঠে।

৩৮। প্রঃ—ভারতীয় চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন কোথায় আছে ?
উঃ—অজন্তা গুহাচিত্রগুলিতে ভারতীয় চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন আজও বিদ্যমান রয়েছে।